নবোদয়

কনিষ্ঠ পূজাবার্ষিকী ১৪৩১



মুখবন্ধ

"কনিষ্ঠ পাবলিকেশন সংস্থা" কর্তৃক প্রকাশিত শারদীয়া ই-পত্রিকা 'নবোদয়' - এ প্রকাশিত উপন্যাস , গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রান্না, লেখক - লেখিকাদের স্বকীয়তার প্রতিভূ। এই সকল লেখাগুলির পুনর্মুদ্রণ কিংবা কোনোরূপ চৌর্যবৃত্তির চেষ্টা করা আইনত অপরাধ।

GOOGLE PLAYBOOKID: 7QQJ7E4KDZP

উৎসর্গ

তাঁর প্রতি যে বাঙালিকে শিখিয়ে গেল শিরদাঁড়া সোজা করে প্রতিবাদ করতে।

সম্পাদনা – সোমাশ্রী মান্না

বিশেষ সহায়তায়–
তুহিনা দাস, কৃষ্ণ রায়, সুমিতা পাল

কবিতা বিভাগের অঙ্কন শিল্পী –
নীহা সাঁধুখা, অঙ্কিতা ভুঁইয়া,
প্রিয়াঙ্কা মহাজন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ– মল্লিকা মুখার্জী

যোগাযোগ

কনিষ্ঠ ফেসবুক পেজ -
facebook.com/konistha

কনিষ্ঠ ইনস্টাগ্রাম পেজ -
instagram.com/mekonistha

কনিষ্ঠ ওয়েবসাইট - konistha.in

কনিষ্ঠ ই মেল - editor@konistha.in
mailme2konistha@gmail.com

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

এ বছরে মা দুর্গার আগমনের আগেই অসুর বধের বিধান এসেছে। মানুষের মুষ্ঠিবদ্ধ হাত উঠেছে , শিরদাঁড়া সোজা হয়েছে, আর মুক্ত কন্ঠে দাবি জানিয়েছে বিচারের। এই বিচার প্রক্রিয়ার মাঝেই আসছেন মা দুর্গা, জগতজননী, অসুরদলনী। বাঙালি এবার প্রতিবাদের ভাষাতেই মেতে উঠেছে পুজোর আনন্দে। উৎসবের গা ভাসালেও হাতে রয়েছে তিলোত্তমার বিচারের অঙ্গীকার।

কনিষ্ঠ প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশিত ' নবোদয়' শারদ সংখ্যা দ্বিতীয় বছরে পা দিলো। গুটি গুটি পায়ে আমরা কেবল হাঁটার চেষ্টা করছি। এখনও শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ানো বাকি। গত বছর হঠাৎই মনের সুপ্ত বাসনাকে রূপ দিতে দিতে নবোদয় পত্রিকার সৃষ্টি। তারপর আপনাদের অকৃত্রিম, অযাচিত ভালোবাসা পেয়ে আমাদের আত্মবিশ্বাস আরোও বেড়ে গেল। যদিও এই কনিষ্ঠ এর দল শক্ত সামর্থ্য হতে পারেনি, তবে টলমল পায়ে চলতে পড়তে আমরা আবার নতুন কিছু গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস নিয়ে চলে এসেছি পাঠকের দরবারে। আমাদের সাহিত্যের অর্ঘ্য আমরা তুলে দিলাম আপনাদের হাতে। পড়ে জানাবেন , কতটা ভালো বা কতটা আরোও ভালো হতে পারত। তবে পড়বেন কিন্তু! আপনাদের উৎসাহেই কিন্তু আমাদের পথ চলা সফল হবে। আপনাদের সমালোচনাই আমাদের আগামী দিনের উন্নতির আলো দেখাবে।

সকলকে জানাই কনিষ্ঠ পরিবারের পক্ষ থেকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। এই পুজোয় মা আসুক সমস্ত অমঙ্গলকে ধ্বংস করতে। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

সোমাশ্রী আঢ্য মান্না

উপন্যাস



সুদীপ ঘোষাল

১

তখন কালিদাস বহরমপুর কলেজের ছাত্র। আরও অনেক বন্ধু আর সন্তুকে নিয়ে কলেজ জীবন কাটিয়েছেন। তিনি কলেজ পত্রিকা সম্পাদনা করতেন।তিনি নিজে কবিতা লিখতেন আর সকলকে উৎসাহিত করতেন লেখার জন্য। ।মাঝে মাঝে কলেজে কবিতার আড্ডা বসাতেন।

তার একজন বন্ধু বললেন,কবিতা লিখে কি হবে?

কালিদাসের বন্ধু সন্তু বলল,কবিতা তো জীবনের অঙ্গ।জীবন সুন্দর ভাবে অতিবাহিত করতে হলে সুন্দর অভ্যাসের প্রয়োজন। আর তার সঙ্গে সাধনা।সাধনা তো সিদ্ধিলাভের উপায়।

কবি বলেন, বন্ধু সন্তু তো ভুল কিছু বলে নি।

সন্তু বলল,কী চিন্তা করছিস?

কবি বলেন,বাড়িতে চাকরি জোগাড় করার কথা বলছে সবাই। একটা চাকরি পেলে সংসারের সুবিধা হয়।

তারপর কবি মন দিয়ে পড়াশোনা করেন। একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে করতেই,নিয়ে রাখেন টীচার ট্রেনিং।তিনি ভাবেন,কোনদিন সুযোগ পেলে শিক্ষক হবেন।

সন্তু ও তার বাকি বন্ধুরা জানত এ ছেলে একদিন অনেক বড় মানুষ হবে।তারপর ১৯১০ সালে তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বিএ পাস করে স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনশাস্ত্রে এমএ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেন; কিন্তু চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আগেই পেশাগত জীবনে প্রবেশ করেন।

তিনবছর পরে, ১৯১৩ সালে রংপুরের উলিপুর মহারানী স্বর্ণময়ী হাইস্কুলের সহশিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। স্কুলের সকলে তাকে সাদরে বরণ করেন।কিন্তু স্কুলে কলিগদের সঙ্গে সবসময় মনের মিল না হলেও সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতেন। স্কুলে পড়াতেন আর অবসর সময়ে লিখতেন।তার বন্ধু শিক্ষকরা তাকে উৎসাহ দিতেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কবি হিসেবে বিশেষ স্থান দখল করেন লেখনীর গুণে।পরে কিছুদিন চব্বিশ পরগনার বড়িশা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করার পর রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের সহায়তায় তিনি কলকাতার মিত্র

ইনস্টিটিউশনের ভবানীপুর শাখায় প্রধান শিক্ষকরূপে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামের ছেলে কালিদাস ছোটো থেকেই কানি নদী আর ব্রম্ভানী নদীর ধারে বসে থাকত বন্ধুদের নিয়ে। বন্ধুরা কালিদাসকে ছোটো থেকেই ভালোবাসত। ১৮৮৯ সালে ২২শে জুন পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে কালিদাস রায়ের জন্ম হয়। শঙ্খধ্বনি, উলুরবে মুখরিত হয়ে ওঠে আকাশ। কড়ুই গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে কালিদাসের পিতা মিষ্টি বিতরণ করলেন ছেলের জন্মের আনন্দে। কালিদাসের বাবা যোগেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন কাশিমবাজার এষ্টেটের কর্মচারী। কালিদাসের মায়ের নাম রাজবালা দেবী। চৈতন্যদেবের জীবনীকার লোচনদাস ঠাকুরের উত্তরাধিকারী ছিলেন বাবা মায়ের অষ্টম সন্তান কালিদাস। তাঁর আগের সাত ভাইবোন জন্মের পরেই মারা যায়। জন্ম থেকে তিনিও ছিলেন খুবই রুগ্ন। কাশিমবাজারে বার বার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে তাঁকে গ্রামের বাড়ীতে রেখে আসা হয়। বর্ধমানের গ্রামে ফিরে এসে অসুস্থতার কারণে তাঁর শৈশবের একাংশ গৃহবন্দী হয়েই কাটে। পাঁচ বছর বয়সে তিনি কাশিম বাজারে ফিরে যান।

তারপর কয়েকবছরের মধ্যে চলে গেলেন বহরমপুর শহরে। রাজবাড়ীর বিত্তবানদের অবজ্ঞা তাঁকে প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। প্রকৃতিই হয়ে ওঠে তাঁর পরম বন্ধু ও কাব্যের প্রেরণা। তার মনে পড়ত কড়ুই গ্রামের কথা, বন্ধুদের কথা। বহরমপুরে তাঁর জীবনের অনেকটা সময় গড়িয়ে যায়।

এখানে তার সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচয় হয় ক্রমশ। সন্তু ছিল তার প্রিয় বন্ধু। বহরমপুরে কে এন কলেজ থেকে স্নাতক হন।এই সময়টা তিনি অনেক মানুষের সঙ্গে মেশেন। কালিদাস সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে ভালোবাসতেন।তাদের সংসারের সুখদুখমাখা জীবনের সদাসঙ্গী হয়ে কাল কাটাতেন। কোনো অহঙ্কার তার মনে বাসা বাঁধতে পারে নি।

কালিদাসের বন্ধু সন্তু বলে, বাবা সংসার চালাতে পারছে না।তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে।

কবি বলেন,তোর বাবা নেপালবাবুর চাকরি নেই, ব্যবসা নেই,টাকা নেই। সে কি করে সংসার চালাবে।খুব কষ্ট রে।

কবি তাকে সাহায্য করেন, বিনা পয়সায় ছেলেমেয়েকে পড়িয়ে।

নেপাল স্ত্রী কুসুমকে বলল,তুমি যেমন করে হোক ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রেখ।আমি চললাম কাজের সন্ধানে।

এই কথা বলে নেপাল চলে এল ভবঘুরের মত বর্ধমানের খানা জংশনে।সেখানে চায়ের দোকানে কাজ পেল খুঁজে।কয়েকমাস পরে এক ব্যাবসাদারের নজরে পড়ে গেল নেপাল।নেপাল বলল,বাবু, আমার ঘরবাড়ি কিছুই নেই।ছেলেমেয়ে, বউ কোথায় আমি জানি না।আমাকে দয়া করুন।মালিক বলল,ঠিক আছে আমার জমির দুকাঠা তোকে দান করলাম।তার বদলে তুই আমার বাড়ির দেখাশোনা করবি আর আমার শিবমন্দিরে নিত্যপূজা করবি।নেপাল রাজী হয়ে গেল।এদিকে নেপালের স্ত্রী কুসুম কোন উপায় না দেখে দিদির বাড়ি চলে এল।দিদি খুব খুশি। তিনি বললেন,তুই আমার কাছেই থাকবি, যতদিন খুশি। ছেলেমেয়ে নিয়ে কুসুম কোনরকমে কষ্টকরে দিদির বাড়িতে থাকতে লাগল।আসলে নেপালবাবু শৌখিন মানুষ ছিল। কিন্তু কোনো কাজ করত না। ধার করে চলত তার সংসার। সৎ লোকের সুখ দেরীতে হয়। গ্রামের সকলের কাছে উপহাসের লোক হয়ে গেছে নেপাল। সে ঠিক করল অন্যত্র গিয়ে ব্যবসা শুরু করবে। সে চলে গেল আহমদপুর থেকে খানা জংশন। একটা গ্রামে গিয়ে পৌঁছে সেখানে লোকজনের সহায়তায় এক ধনী বাড়িতে পুরোহিতের কাজ পেল। নেপালবাবুর দুই ছেলে ও স্ত্রী খেতে না পেয়ে ট্রেনে চাপলো ভিক্ষা করতে। স্ত্রী কুসুম ছেলেদের খাওয়ালো দানের পয়সায়। তারপর ভাবলো,এই স্টেশনে নেমেই তো দিদির বাড়ি যেতে হয়। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ট্রেন থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করে কুসুম দুই ছেলেকে নিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যায় দিদির বাড়ি। সেখানে গিয়ে প্রথমে স্নান করে দুই ছেলেকে নিয়ে খেয়ে নেয়। তারপর শুরু করে এক নতুন জীবন। সকালে উঠে কুসুম দিদিকে সাহায্য করে রান্নায়। দিদি বলেন, তুই

শুধু দুই ছেলেকে নিয়ে সুস্থ হয়ে থাক। তোর জামাইবাবু খুব ভালো লোক। সে অতিথিকে কাজ করতে দেয় না। দিদির তিন ছেলে। সকলে একসাথে আনন্দে দুবছর পার করে ফেলে।এদিকে খানায় কুসুমের স্বামী জায়গা কিনে মাটির বাড়ি তৈরি করে। ছেলেদের আর কুসুমকে সংবাদ পাঠায় আসার জন্য। অনিমেষ নেপালের বাড়ির পাশেই থাকে।সে প্যারাটিচার।এখন চাইল্ড রেজিস্টারের কাজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের নাম সংগ্রহ করছে।পুরো দুটোবুথের ভার তার উপরে পড়েছে।একটা টোটো ভাড়া করে অনিমেষ প্রথমে হাজরাপাড়ায় গেল।টোটো থেকে নেমে সে দিবাকরকে জিজ্ঞেস করল,তোমার ছেলেমেয়ে কটা? দিবাকর বলল,এক ছেলে আর এক মেয়ে।
- আচ্ছা, ওদের জন্মসার্টিফিকেট বের করো তো।
- ঠিক আছে
কিছুক্ষণের মধ্যেই দিবাকর জন্মসার্টিফিকেট বের করে অনিমেষের হাতে দিলো।অনিমেষ জন্মের তারিখ লিখে নিল,মোবাইল নাম্বার,পিতামাতার নাম,জন্মস্থান ও আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ করে আবার অন্য বাড়িতে ঢুকল।এইভাবে একটা একটা করে প্রায় কুড়িটা বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে বারোটা বেজে গেল। অনিমেষ টোটোভাড়া মিটিয়ে নিজের বাড়িতে গিয়ে স্নান,খাওয়া সারলো।এদিকে অসুস্থ মা বিছানায় পড়ে আছেন।ছেলেটা এম,এ পড়ছে।স্ত্রী বিকেলে টিউশানি পড়ায়।সবমিলিয়ে অনিমেষের সংসারে একটা শান্তির পরিবেশ বিরাজমান।

২

অনিমেষও কবির সঙ্গে একই কলেজে পড়ত।এখন চাকরি করে একটা স্কুলে। কবি বন্ধুদের এবং তাদের পরিবারের খুব খেয়াল

রাখতেন।আজীবন তিনি মানুষের সঙ্গে চলেছেন,মানুষকে, প্রকৃতিকে ভালোবেসেছেন।সুখ দুখ,হাসি কান্নাকে সমানভাবে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন।

পরেরদিন সকালে উঠেই স্ত্রীর কান্নাশুনে বহরুমপুরের অনিমেষ মায়ের ঘরে যায়।মা মারা গেছেন রাতে।সকালে অনিমেষের স্ত্রী উঠে প্রথমে দেখে। কবি খবর পেয়ে বন্ধুর বাড়িতে আসেন।
অনিমেষ কান্নাভেজা গলায় কবিকে বলে,মা ছিলেন বলে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম।এবার মাছাড়া কি করে চলবে সংসার জানি না।মা ছিলেন একটা বটগাছের মত।তার আশ্রয়ে বড় হয়েছি।যাইহোক তারপর সব কর্তব্য সারা হলো। শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে কাজ শেষ করে এস,আই অফিসে জমা দিল অনিমেষ। এখন স্কুল ছুটি।অবসরে বাড়ির কাজগুলো সেরে ফেলে অনিমেষ।

অনিমেষের ভাই, সুবীর পড়াশোনায় ভালো।তবে ছোটথেকে একা একা মানুষ হওয়ায়, অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলতে তার অসুবিধা হয়।একান্নবর্তী পরিবারে কিন্তু এই অসুবিধা ছিল না। সকলে মিলেমিশে থাকার ফলে ছেলেমেয়েদের মনের স্বাস্থ্য ভালো থাকত।এখন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি।নিজেরটা গুছিয়ে নেওয়ার দিন।তারফলে দাদু দিদা বা কাকা পিসির আদর, স্নেহ তারা উপলব্ধি করতে পারে না। কবি বলেন,যত দিন যাবে মানুষ নিঃসঙ্গ হবে মানুষের নিজের দোষে।
এবার বর্ষাকাল এল।অজয়নদের ধারে বাড়ি।শ্রাবণমাসের একটানা বৃষ্টি ও ডিভিসির জলছাড়ার কারণে বন্যা দেখা দিল। বন্যায় অনেকের ঘরবাড়ি ভেঙে পড়েছে।অনিমেষের বুক কাঁপছে।কারণ তার বাড়িতেও জল ঢুকছে।অনিমেষ ও তার পরিবার অতি দ্রুত মালপত্তর নিয়ে স্কুলবাড়িতে আশ্রয় নিল। একতলা সমান উঁচু জল, আরও বাড়ছে। স্কুলবাড়ি তিনতলা হওয়ায় প্রাণ শেষ হওয়ার আশঙ্কা কমলেও অনিমেষের বাড়ি ভেঙে নদীগহ্বরে চলে গেলো। অনিমেষের স্ত্রী ও ছেলে কান্নাকাটি শুরু করল।কিন্তু অনিমেষের তো কাঁদলে হবে না।কয়েকদিনের মধ্যেই বন্যা কমে গেলে অনিমেষ পঞ্চায়েতে আবেদন করে

এককাঠা জমির ওপর বাড়ি করার জন্য তিনলাখ টাকা পেল। অনিমেষ ও আরও অনেকে যাদের বাড়ি নদীর গর্ভে চলে গেছে তারা বাড়ি তৈরি শুরু করল।আবার নতুন পাড়া গজিয়ে উঠল। অনিমেষ পুরোনো বাড়ির পথে পা বাড়ালো।ভিটে বলতে এটুকুই ছিল, তবু সেটাও কেড়ে নিল ভয়ঙ্কর বন্যা।এখন সে কি করে সংসার চালাবে চিন্তা করে ব্যাকুল হল।

কালিদাস জানত, সন্তুর দুই ভাই ও এক বোন।নেপালের বড়ছেলের নাম সন্তু। আর ছোটছেলে নন্তু।নেপাল কষ্টকরে মেয়ে সুমনাকে পাত্রস্থ করতে চায়।সন্তু ছোটো থেকেই মায়ের নেওটা। মা ছাড়া সে কিছু বোঝে না,চেনে না। ফলে মায়ের স্নেহছায়া একটু বেশি পেতো সে। মা জানতেন এই ছেলে আমার অবর্তমানে অন্য ছেলেমেয়েদের দেখবে। সন্তুর বাবা ছিলেন সরকারী কর্মচারী। তিন ছেলে আর দুই মেয়েকে পড়াশোনা শেখাতে সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন। খাওয়া পরার কোনো অসুবিধা নেই। বেশ চলছিলো বটগাছের ছায়ায় সাতটি জীবন। কিন্তু মহাকালের বিচার মানতেই হবে। হঠাৎ মারা গেলেন সন্তুর বাবা।

তখন কবির বয়স একুশ। মেট্রিক পাশ করে বহরুমপুরে কে এন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর পেশাগত জীবনে প্রবেশ করেন।সংসারের সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন কবি। এবার বাবা মাকে সেবাযত্ন করা কাজ কবির সামান্য মাইনের টাকায় চলত। নতুন চাকরী, মাইনে কম, তাও আবার বদলির চাকরি। আজ হাওড়া তো কাল শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি থাকাকালীন ছুটির দিনে একা এক ঘুরে বেড়াতেন কবি। একবার দার্জিলিং গিয়েছিলেন। পাহাড় তাকে ডাকতো। ভালোবাসা ধরে রাখতো সবুজ প্রকৃতি। তিনি সমতলের ছেলে। আর পাহাড়ি ছবি তার মনে শান্তি আনতো। মন খারাপ হলেই পাহাড়ের ডাকে বেরিয়ে পড়তেন বারে বারে। শিক্ষক জীবনে প্রবেশের আগে কবির জীবন ছিল কষ্টের।সন্তু কবিকে একা পেয়ে নদীর ধারে বসে নিজের জীবনের গল্প বলতে শুরু করে। সন্তু বন্ধুকে বলে,
তার বাবা পরলোকে চলে গেলে তার চাকরিটা সে পায়।একরাতে বাড়িতে খাবার নেই। মাইনের টাকা সে গ্রামের বাড়িতে মায়ের

পাঠিয়ে দিয়েছে। সামান্য কটা টাকা আছে। সন্তু জানে মাস চালাতে হবে। রাত বেশি হওয়ায় দোকানগুলো বন্ধ। একগ্লাস জল ঢকঢক করে পান করলো। অমৃতের স্বাদ। কিন্তু পোড়া পেট মানে না বারণ। চুঁই চুঁই করছে। তবু লেপ মুরি দিয়ে শুয়ে পড়লো। গুরুর জপ শেষ করে ঘুমোয় সন্তু। জপ করার সময় শুনতে পেলো ঠক ঠক আওয়াজ। তাড়াতাড়ি জপ শেষ করে বললো,কে?

----আমি, দরজাটা খুলুন।

-

-"দরজা খুলে দেখলো বাড়িওয়ালার সুন্দরী অষ্টাদশী মেয়েটা। হাতে একটা থালা। বললো,আজকে আমাদের সত্যনারায়ণ পুজো ছিলো মা তাই প্রসাদ পাঠালেন। খেয়ে জল খাবেন। প্রসাদ খেয়ে জল খেতে হয়"



-----জগতে সবাই তো আমি। নাম বলুন।
-----আমি পাপিয়া,
------এত রাতে
------আরে খুলুন না ছাই।

দরজা খুলে দেখলো বাড়িওয়ালার সুন্দরী অষ্টাদশী মেয়েটা হাতে একটা থালা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। সে বললো,আজকে আমাদের সত্যনারায়ণ পুজো ছিলো মা তাই প্রসাদ পাঠালেন। খেয়ে জল খাবেন। প্রসাদ খেয়ে জল খেতে হয়।
সেদিন রাতে সেই প্রসাদ খেয়ে সন্তু ঘুমিয়েছিলো।বাড়িওয়ালার মেয়ে পাপিয়া দেখতো, সন্তু সকালে বেরিয়ে যায় আর রাতে ঢোকে। তার মানে হোটেলে খায়। কোনোদিন বেশি কথা বলে না। শুধু বলে,ভালো আছেন। আর ভাড়া দিতে এলে বলে,বাবা আছে। পাপিয়া মা আর বাবাকে বললো,আমি সন্তুদার কাছে ইংরাজীটা দেখে নেবো। বাবা খুব কিপটে। বিনা পয়সায় পড়ানোতে আপত্তি নেই। মা বললেন,ছেলেটা ভালো।যাবি প্রয়োজন হলে।রাতে সন্তু এলে পাপিয়া বই নিয়ে ওর ঘরে গেলো। লুঙ্গি পরে তক্তায় সন্তু বসেছিলো। সন্তু বললো,কিছু বলবে;

-------হুঁ,একটু ইংরাজীটা দেখিয়ে দেবেন?
------কই দেখি, আমি পড়তে ভালোবাসি।

------আর পড়াতে
------দুজনে আলোচনা করবো। ইংলিশ আ মার বেস্ট সাবজেক্ট ছিলো।

-----তাই,তাহলে ভালোই হলো।

সন্তু বলে,আমি দেখছি পাপিয়ার পড়াশোনায় মন নাই। শুধু কথা বলছে। বলছে,আপনি এত অগোছালো কেন? তারপর দেখি সে সব কিছু গোছাতে শুরু করেছে। আমি বললাম,তুমি বড়লোকের একমাত্র কন্যা আমার কাজ করবে কেন? উত্তরে সে বলল,

-----আমি এসব দেখতে পারি না। আপনি চুপ করে বসুন। আর আমি একবার করে আপনার কাছে গল্প করতে আসবো। তাড়িয়ে দেবেন না তো?
-----না,না আমিও তো একাই থাকি। কথা বলার সঙ্গী পাবো।
-----বাবাকে বলবেন,আমি খুব পড়ি।
-----মিথ্যা বলতে নেই। যা বলার তুমি বলবে। আমি কিছু বলবো না।

-----ঠিক আছে, আপনি ক্যাবলার মতো এসব বলবেন না।

------আমি এসব ভালোবাসি না।

সন্তু বলে,আমি ভাবতাম মেয়েটা কি চায়? আমার মাথার ওপর বড়ো সংসারের দায়ীত্ব। আমাকে সাবধানে চলতে হবে।পুজোর ছুটিতে সন্তু বাড়ি এসেছে। মায়ের জন্য সাদা তাঁতের শাড়ি। ভাইদের জন্য এক ধরনের জামা,প্যান্ট এবং বোনেদের চুড়িদার এনেছে। বাড়িতে দুর্গাপুজোর পালা। আগের দিন রাত থেকে সব্জি বনানো,কুটনো কাটা শুরু হলো। অনেক লোকজন বাড়িতে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা। বড়ো বড়ো গামলায় রেখে সব্জি সব উঠোনে নামানো হলো। কাল সকালবেলা রান্না হবে। সন্তুকে ওর মা বলে,এবার বিয়ে করে নে বাব। আমি দোনাগ্রামে মেয়ে দেখে রেখেছি। কথাও বলেছি। মায়ের কথা ফেলতে পারে না সন্তু। সে সম্মতি দিলো। তা না হলে মা দুঃখ পাবেন।

পুজোর ছুটি ফুরিয়ে গেলে সন্তু ফিরে এলো শিলিগুড়ি। এসেই দেখলো,পাপিয়া হাতে একটা চিঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সন্তু বললো,কি এটা।

----পুজোতে তোমার জন্য লিখেছি।
---থাক,তোমার কাছে থাক। আমার আবার ট্রান্সফারের অর্ডার এসেছে। কাল মোবাইলে মেসেজ পেয়েছি। আজকে নোটিশ পাবো অফিসে।
----কিন্তু আমি যে অনেক কিছু দিয়েছি তোমাকে। আমার মন,প্রাণ সবকিছু।

সন্তু দরজা খোলামাত্র পাপিয়া জড়িয়ে ধরলো তাকে। চোখের জলে তার জামা ভিজিয়ে দিলো। আর সন্তু তো কাঁদতে পারছে না। পাপিয়ার জন্য তার মন পাপিয়া কতবার যে ডাক দিয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নাই। সন্তুর ভাড়া বাড়ির টালির চাল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো, চাঁদ আজ ঢেকে গেছে অন্ধকারে।সংসারে কর্তব্য করে যায় এক জাতীয় মানুষ। তারা নিজের আবেগ,ভালোবাসা বিসর্জন দেয় সকলের জন্য। আর এক জাতীয় মানুষ তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার ক'রে দূরে ছুঁড়ে ফেলে। সন্তু এবার বাড়ির কাছে চলে এলো। খেয়ে বাড়ি থেকে বেরোয় সকাল দশটায়।মা খুব খুশি সন্তুর। বিয়েতে ভালো পাওনা হয়েছে। কুড়ি ভরি সোনা এনেছে বৌমা। সন্তুর বিয়েতে কলিগরা সবাই এসেছে। সন্তুর ফোন বেজে উঠলো। ফোনে পাপিয়ার গলা। বলছে,আমার বিয়ে সন্তুদা। তুমি ভালো থেকো। সন্তু ফোনটা কেটে দিলো। কেউ শুনতে পেলে অসুবিধা হবে। মনকে শক্ত বেড়ি পরিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসলো। বিয়ে হয়ে গেলো। শেষ রাতে অর্ধেক চাঁদের আলোয় সন্তু পাপিয়াকে দেখলো বাগানের মধ্যে। স্বপ্নটা ভেঙ্গে গেলো। আজ বিয়ের পরদিন। কালরাত্রি। বৌয়ের মুখ দেখতে নেই।ফুলের শয্যায় কাঁটা। বৌ জয়ার শরীর খারাপ। সন্তুর বন্ধুরা পরের দিন বললো,নতুন অভিজ্ঞতা কেমন হলো?

সন্তু বললো,ভাগ্য প্রসন্ন নয়। অপেক্ষায় আছি। বন্ধুরা হতাশ। তারপর খাড়া বড়ি থোর,থোর বড়ি খাড়া। মামূলী জীবন। চাকরী। দিন কাবার। রাত। ভোর।রান্না। স্নান।জপ।খাওয়া। সাইকেল। অফিস।মা বললেন, বোনের বৈশাখ মাসে বিয়ের ঠিক করেছি। তুমি লোন নাও। বৌমার গহনাগুলো দাও। মায়ের কথা অনুযায়ী সব কিছু হলো। জয়া সব সোনা দিয়ে দিলো। দুটো ননদের বিয়ে হলো। বড় ভাই লন্ডন চলে গেলো সবাইকে ফেলে। ভালো চাকরী পেয়েছে। ছোটোভাই গ্রামেই একটি মেয়েকে প্রেম করে বিয়ে করলো। ভালো চাকরী পেয়ে কলকাতায় চলে গেলো। সন্তু খুশি। মাও খুশি। মা বললেন,সবাই ভালো থাকলেই ভালো। মা কিন্তু সন্তুর কাছেই থাকলেন। স্বামীর ভিটে তার কাছে স্বর্গ। আর কোথাও তার ভালো লাগে না। নেপাল ও কুসুম তাদের মেয়ে সুমনার ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছে। সন্তুর এখন দুই ছেলে। মাকে সঙ্গে নিয়ে বেশ সুখেই আছে। কিন্তু সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। নেপালের বড়ছেলে নন্তুর, রুমকি ও ঝুমকি দুই মেয়ে। রুমকি এখন ক্লাস টেনে পড়ে আর ঝুমকি সেভেনে। দুজনেই এক গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তো। রুমকি সেন্ট আপ হলো। কিন্তু ঝুমকি অ্যানুয়াল পরীক্ষায় ফেল করলো। সন্তু আর জয়া খুব বকাবকি করলো। বললো,সারা বছর পড়বি না, তাহলে ফেল করবি না তো কি? গৃহশিক্ষক বললো,যা, গলায় দড়ি দেগা। ফেল করে বসে আছে। ঝুমকির মন খুব খারাপ হয়ে গেলো। সে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকলো। বাড়ির সবাই জানে কিন্তু কেউ একবারও তাকে ডাকলো না। ঝুমকি ভাবলো,কেউ আমাকে চায় না। ভালোবাসে না। সে শুনতে পেলো কে যেনো বলছে গলায় দড়ি দিয়ে মর। সব ঠিক হয়ে যাবে। কে বলছে? সে ভাবলো ঠিকই বলেছে। আমি খারাপ মেয়ে। গৃহশিক্ষক অজয় আমার যৌনাঙ্গে আঙুল দিয়ে রক্তাক্ত করে বলেছিলো। পড়াশোনা তোর হবে না।এইসবই হবে। গলায় দড়ি দেগা। অজয়ের মুখ থেকে মদের গন্ধ পেয়েছিলো। কাউকে বললে, প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়েছিলো। সেদিন তার দিদি ছিলো না। দিদিকেও হয়তো ভয় দেখিয়েছে। পরক্ষণেই তার মনে হচ্ছে,

আমি মরে গেলে ওই মাতালটা আরও অনেক মেয়েকে মারবে। কিন্তু ওর বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই। বাবা, মা পর্যন্ত আমাকে ডাকলো না। আমার খিদে পেয়েছে। একবারও ডাকলো না। ভাবতে ভাবতে তার ওড়নাটা গলায় গিঁট দিলো। খুব লাগছে। তারপর মাটির ঘরের কড়িকাঠে, ওড়নাটা, পেঁচিয়ে নিলো চেয়ারের ওপর উঠে।তারপর চেয়ারটা লাথি দিয়ে সরিয়ে ঝুলে পরলো। তারপর ভাবছে। কেন করলো এই কাজ। খুব ভুল করলো। মা বাবার মুখ মনে পরলো তার।সন্ধেবেলায় সন্তু এসে জয়াকে বললো,দাদার মেয়েটা খেয়েছে?ঘর খুলেছে?জয়া বললো,জানিনা, যাও তুমি দেখো। ঘরের ফাঁক দিয়ে দেখলো মেয়েটা ঝুলছে। সন্তু ভাবে, এই সময় মা থাকলে ভালো হতো। মা বোনের বাড়ি কেন গেলো? কালীদাস সন্তুকে বলেছিল, রাখে হরি মারে কে।গোপালের চরণে ভরসা রাখবি।জীবনে ভালোই হবে।

৩

বহরমপুর কে এন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সন্তুর শরীর কাঁপছে থর থর করে।সে কড়ুই থেকে এখানে এসে বাস করছে।এখন তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না।মনে পড়ছে কবিবন্ধুকে।যদি পাশে থাকত,পরামর্শ করা যেত।জয়া দেখতে এলো স্বামীকে, ধপ করে একটা আওয়াজ শুনে। এসে দেখলো,সন্তু অজ্ঞান হয়ে পরে আছে। জয়া দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলো মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে, ঝুলছে। বাড়ির আশেপাশে যারা ছিলো তাদের চিৎকার করে ডাকলো জয়া। লোকজন এলো।দরজা ভাঙলো। মৃতদেহ নিয়ে চলে গেলো দাহকাজে।সন্তু আর জয়া দুবছর রাতে ঘুমোতে পারে নি। একটা অপরাধবোধ তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো। হয়তো তাদের ভুলে মেয়েটা অভিমানে চলে গেলো অকালে। বড়ো মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলো সন্তু।

জয়া ভাবে তার জন্মকালের কথা। মায়ের মুখে শুনেছে,জন্মমাত্রই তাকে মৃত মনে করে বাড়ির লোকজন ফেলে দিয়েছিলো বাঁশতলায়। আঁতুড় ফেলার জায়গায়

বাগ্দীবুড়ি দেখতে পেয়েছিলো জ্যান্ত মেয়েটাকে।হাত, পা নড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিলো কোলে। খবর ছড়িয়ে পরলো গ্রামে। তখন বাড়ির লোক এসে নিয়ে যায় মেয়ে। বাগ্দীবুড়ি নাম রেখেছিলো জয়া। ও তাদের বাড়ি এসে বলেছিলো,ও জীবন জয় করেছে। তাই ওর নাম জয়া। তারপর জয়া বড়ো হলো। কালো মেয়ে আলো রূপ নিয়ে ভরতি হলো স্কুলে। পড়াশোনায় খুব ভালো। অন্যদের থেকে আলাদা। নীরব শিল্পীর মতো তার স্বভাব। সবাই ভালো বলতো তাকে। তারপর কলেজে ভরতি হলো। কিন্তু কলেজে পড়তে পড়তেই তার বিয়ে হলো। তিন সন্তানের জননী হলো। কাজ হলো হাঁড়ি ঠেলা। আত্মীয়স্বজনের কাছে ভালো হবার ব্যর্থ চেষ্টা। কম বয়সে শিখলো অনেক। শক্তি জাগ্রত হলো শরীরে,মনে। সহজ পথে চলা শুরু হলো। তেল মাখানো কথাও বন্ধ হলো। শত্রু বাড়লো। তবু সে বললো,কুছ পরোয়া নেহি। একটা মেয়ে ইচ্ছে করলে পৃথিবীর সব কঠিন কাজ হাসিমুখে করতে পারে। দশভূজা দুর্গা। স্বামীর অফিসের রান্না,ছেলে মেয়েদের স্কুল পাঠানোর পরে বাসনমাজা,কাপড়কাচা ও আরও কত কি? দুপুরবেলা বই নিয়ে বসে ঘুমে ঢুলে পরতো জয়া। আবার কোনো কোনো দিন ভাবনার সাগরে ডুব দিতো অনায়াসে। মনে পরতো কিশোরীবেলার স্কুলের পথে আলপথের ধারে ক্যানেলের জলে রং বেরংয়ের মাছের কথা। গামছা দিয়ে ছেঁকে তুলতো বায়েনবুড়ো কত মাছ। বায়েন বুড়োর কাছে চেয়ে একটা বোতলে ভরে রাখতো জল। আর তাতে সাঁতার কাটতো ছোটো ছোটো তেচোখা মাছ। পুকুরের ধারে বসতো বুড়ি গিন্নির ছাই দিয়ে বাসন মাজা দেখতে। কি ভালো যে লাগতো। মনে হতো দিই বুড়ির বাসন মেজে। কিন্তু সাহস করে বলতে পারে নি কোনোদিন। সন্ধেবেলা সিধুকাকা পড়াতে আসতো। আমরা মেয়েরা সুর করে পড়তাম একসাথে। তারপর খাওয়ার পরে শোওয়ার পালা। ঠাকুমার পাশে শুয়ে শুনতাম পুরোনো দিনের কত গল্প। গল্প শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পরতাম ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরে। জয়া এইসব ভাবতো আর বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামতো ঘাটে। স্বামী,ছেলে,মেয়েরা চলে আসতো জয়ার স্বপ্ন নীড়ে। আবার শুরু হতো সংসারের ঘানিটানা কলুর বলদের মতো। দুঃখ,সুখের

অপূর্ব মিশ্রণে বয়স কাঁটা এগিয়ে চলে টিক টিক শব্দে।

সন্তু মেয়ের বিয়ে দিলো। তারপর গ্রাম ছেড়ে চলে এলো কোয়ার্টারে। গ্রামের বাড়িতে সবখানে ভেসে উঠতো মৃত মেয়ের মুখ। তাই এই সিদ্ধান্ত। কোয়ার্টারে সন্তুর মন হাঁপিয়ে উঠতো। অফিসে ছুটি পেলেই চলে যেতো মেয়ের শ্বশুর বাড়ি। সেখানে বড়ো মেয়ের মুখ দেখে ভুলে যেতো মৃত মেয়ের মুখ। আর দুই মেয়ের মুখের আদলে দুবছর পরে ঘর আলো করে এলো নাতি। মেয়ের পুত্রসন্তানের মুখ দেখে সন্তু ও জয়া ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে লাগলো।নাতি ও মেয়ে এসে দুমাস, তিনমাস করে থাকতো কোয়ার্টারে। এবার মন শক্ত করে সন্তু ফিরে এলো গ্রামের বাড়িতে। কোয়ার্টারে তার মন ভারী হয়ে যেতো। নিজেকে হারিয়ে ফেলতো বারে বারে। এবার গ্রামে এসে পুরোনো বন্ধুদের মাঝে সন্তু জীবন খুঁজে পেলো। সব কিছু স্বাভাবিক হলো।

নেপালের বড়ছেলে সন্তু কাজ করতো বি,ডি,ও অফিসে। এই অফিস থেকেই গ্রামের গরীব মানুষরা সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকে। তার প্রধান দায়িত্বে ছিলো সন্তু। গ্রামে গ্রামে গিয়ে লিষ্ট করতো সে। গ্রামের লোকেরা খুব ভালোবাসতো সন্তুকে। কোনোদিন অন্যায়ভাবে কারও কাছে টাকা পয়সা ঘুষ নিতো না সন্তু। একবার রঘু ডাকাত বললো,আমার বাড়ি মিষ্টি, জল খান কেনে। আমি খুশি হবো। সন্তু বললো,আমাকে এক গ্লাস জল দাও। আর কিছু খাবো না। আমি এখন সরকারী কাজ করছি। এর জন্য আমি মাইনে পাই। জামাইমারি গ্রামে একবার সন্তু কাজে গেছিলো। ফিরতে রাত হয়ল গেলো। রাস্তায় দেখলো,অন্ধকারে ঝিনুকঘাটা পুলের তলায় একদল সশস্ত্র লোক। ওরা ডাকাত। কারও হাতে খাঁড়া,কারও হাতে বল্লম, কারও হাতে তীরধনুক। একজন এসে বললো,আংটি কই? সোনার চেনটাও দে। সন্তু বললো,দি,এই নাও। ওদের মাঝে রঘু ছিলো খাঁড়া হাতে। ও এগিয়ে এসে বললো,আরে ঠাকুর মশাই। আপনি। যান, যান কোনো ভয় নাই। দলের লোকদের উদ্দেশ্য করে বললো,তোরা লোক চিনিস না। আমাদের ব্লকের বড়বাবু। সবাই জোড় হাত করে বললো,মাপ করবেন,আমরা বুঝতে পারি

লাই গো ঠাকুর মশাই। মদ খেয়ে আচি তো। যান, যান। কুনু ডর লাই। মজা করে হাঁটেন। কুথাও দাড়াবেন নি।সন্তুর ধড়ে প্রাণ এলো। ঝিনুক ঘাটা পার হয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলো। বাড়িতে এসে জল খেয়ে বাঁচলো।

সন্তু ও কালিদাস তাদের মায়ের কাছে শিক্ষা পেয়েছে সততার। তখনকার ভারতবর্ষে ১৯০৭ সালে তাঁর প্রথম কাব্য কুন্দ প্রকাশিত হয়।তখনকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তেমন সুখময় ছিল না।

যদিও ১৯০৭ সাল নাগাদ নতুন প্রদেশটিতে সাম্প্রদায়িকতা সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে, তবুও কিছু সংখ্যক শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে এ ধর্মীয় বিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য বিচক্ষণ ও আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯০৭ সালের ১৫ মার্চ তারিখে উভয় সম্প্রদায়ের একদল বিশিষ্ট সদস্য ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা তাঁর নিকট সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার পরিসমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ ও দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রীতির উন্নতি বিধানের পরামর্শ রাখেন।

নতুন প্রদেশটিতে ভূস্বামী ও প্রজাদের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং তা সাম্প্রদায়িকতার দিকে মোড় নেয়। বিভক্তি-বিরোধী বিক্ষোভকারিগণ সন্ত্রাসবাদী কার্য্যাবলি পরিচালনা করলে হিন্দু ভূস্বামিগণ বিপদাশঙ্কা অনুভব করে। সরকারের প্রতি তাদের অবিচল আনুগত্যের সততার পরীক্ষা দিতে এবং বিক্ষোভের প্রতি তাদের নেতিবাচক মনোভাবের প্রমাণ রাখতে তারা যে অসাম্প্রদায়িক অবস্থান গ্রহণ করবে ও সরকার বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে একত্রিতভাবে কাজ করবে সে জন্য তারা মুসলমান জমিদার সম্প্রদায়ের দিকে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

৪

তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থান তখন চরমে।

কবির কবিতা কথা বলে।কবি বিখ্যাত হয়েছেন এখন।আনন্দ পুরষ্কার পেয়েছেন। ভারতবর্ষের অবস্থা তখন চরমে। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠনের পেছনে বিভিন্ন কারণ থাকলেও বঙ্গভঙ্গ ও তার প্রতি হুমকি সম্ভবত এর উদ্ভবকে ত্বরান্বিত করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের প্রথম বৈঠকে একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে: 'এ সভা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সুস্পষ্ট স্বার্থের কথা চিন্তা করে অভিমত প্রকাশ করে যে, বিভক্তি নতুন প্রদেশটির জনগণের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমানদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হবে এবং বর্জনের মতো সকল প্রকারের বিক্ষোভকে প্রচণ্ডভাবে নিন্দা ও নিরুৎসাহিত করা উচিত।'

এদিকে বাঙালি হিন্দুদের অসন্তুষ্টিকে প্রশমিত করতে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গকে রদ করার সিদ্ধান্ত নেয়। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সরকার বলে যে, নতুন প্রদেশটিতে বসবাসকারীদের মধ্যে মুসলমানগণ অত্যধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ তো ছিলই, নতুন বিন্যাসের আওতায়ও আনুমানিক সংখ্যাগত দিক থেকে তারা হিন্দুদের সমান অথবা সম্ভবত শেষোক্তদের চেয়ে কিছুটা উচ্চতর অবস্থায়ই বিরাজ করবে। মুসলমানদের স্বার্থসমূহ আইন পরিষদ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বিশেষ প্রনিধিত্বের দ্বারা রক্ষা করা হবে।

লর্ড চার্লস হার্ডিঞ্জ, মিন্টোর স্থলাভিষিক্ত হন এবং ১৯১১ সালের ২৫ আগস্ট গোপনে প্রেরিত এক বার্তায় ভারত সরকার ভারতের প্রশাসনে নির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ করে। সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের উপদেশ অনুযায়ী রাজা পঞ্চম জর্জ ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে দিলিতে তাঁর রাজ্যাভিষেক দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ করা ও ভারতের প্রশাসনে সুনির্দিষ্ট কতিপয় পরিবর্তন আনয়নের কথা ঘোষণা করেন। প্রথমত, ভারত সরকারের রাজধানী কলকাতার পরিবর্তে দিল্লিতে হওয়া উচিত। অতীতের মুসলিম গৌরবের নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে

ব্রিটিশগণ পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক ক্ষমতা ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা হারানোর দুঃখে কাতর মুসলমান সম্প্রদায়কে শান্ত করার আশা করছিল। দ্বিতীয়ত, পাঁচটি বাংলা ভাষাভাষী বিভাগ, যথা, প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামকে একত্রিত করা ও একটি প্রেসিডেন্সিতে সংগঠিত করা হবে যার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন সপরিষদ গভর্নর। এ প্রদেশের আয়তন হবে আনুমানিক ৭০,০০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা হবে চার কোটি বিশ লক্ষ। তৃতীয়ত, বিহার, ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে গঠিত প্রদেশটি শাসনকার্য পরিচালনা করবেন আইন পরিষদসহ সপরিষদ লেফটেন্যান্ট গভর্নর। চতুর্থত, আসাম চীফ কমিশনারের শাসনে প্রত্যাবর্তন করবে। বিভক্তির আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ও বাংলার পুনরেকত্রীকরণের দিন ধার্য হয় ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল। বাঙালি হিন্দুদের ক্রোধকে কিছুটা প্রশমিত করে বটে, কিন্তু কলকাতাকে ভারতের রাজধানী থেকে কেবল প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদায় নামিয়ে আনায় তারা আহত হয়। এতে কলকাতার ভূ-সম্পত্তিগত মূল্যে নিম্নগতি দেখা দেয়। রাজনৈতিক কার্য্যাবলির স্নায়ুকেন্দ্র হিসেবে কলকাতাকে তার মুখ্য অবস্থান থেকে বঞ্চিত করা হলে তা অবধারিতভাবে বাঙালি হিন্দুদের প্রভাবকে দুর্বল করে ফেলে। সরকারের উপলব্ধি ছিল যে, এ রকম পদক্ষেপ থেকে যে প্রধান সুবিধা পাওয়া যাবে তা হলো, বাংলার বিক্ষুব্ধ পারিবার্শ্বিক অবস্থা থেকে ভারত সরকারের রাজধানী অন্যত্র সরিয়ে নেয়া যাবে।

উদার সহানুভূতিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকরী লর্ড কারমাইকেলকে পুনরেকত্রকৃত বাংলার প্রথম গভর্নর মনোনীত করা হয়। ভারতীয় ইতিহাস ও জাতীয় জীবনের ওপর বঙ্গভঙ্গ ও এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। বাঙালি হিন্দুরা স্বদেশী ও বর্জনের যে দ্বৈত অস্ত্র অবলম্বন করে তা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মতবাদে পরিণত হয় এবং পরবর্তী সংগ্রামে অধিকতর ফলপ্রসূভাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি গান্ধীর অসহযোগ, সত্যাগ্রহ ও খাদি আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। তারা আরও শিক্ষালাভ করে যে, সুসংগঠিত রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও সমালোচনামূলক

জনমত সরকারকে জনতার দাবিদাওয়া মেনে নিতে বাধ্য করতে পারতেন।

৫

কবির অনেক বন্ধু। সন্তু ছাড়াও কলেজ জীবন ও চাকরি জীবনের বন্ধুরা তার কাছে এসে নিজেদের সুখদুখের কথা বলে। মন দিয়ে শোনে কালিদাস।

সন্তু তার সততার জন্য আজ সে খেতে পেলো। মনে পরছে সন্তুর মায়ের কথা। সে আপন মনেই বলে চলেছে তার মায়ের কথা। কারণ মা এখন সুমনার কাছে থাকেন।বাবা পরলোকে চলে গেছেন অনেক আগেই।পুত্রবধূদের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে মা, কুসুম এখন তার মেয়ে সুমনার কাছে থাকেন।সন্তু মাকে ভুলতে পারে না।মনে পড়ে তার, মা রক্ষাকালীর পুজো দিতে দিতে গেয়ে উঠতেন ভক্তিগীতি। নিরামিষ মা কালীর আশীর্বাদ মাথায় রেখে ছেলেদের নিয়ে সংসার চালাতেন ছন্দে। অভাব থাকলেও কোনোদিন তার ছাপ পরেনি মায়ের চোখেমুখে। আসল মূল্যবান রত্নের সন্ধান তিনি পেয়ে গেছিলেন পুজোর আসনে বসে। কোনোদিন তার কথায় প্রকাশ পেতো না সেসব কথা। তার চলনে, বলনে ফুটে উঠতো মাতৃরূপের জলছবি। মাকে দেখেই মাথা নত হয়ে যেতো সকলের। দাদু মাকে, মা বলেই ডাকতেন। তিনি সময়ে অসময়ে মাকে রামপ্রসাদী শোনাতে বলতেন। মায়ের গান শুনতে শুনতে একদিন চলে গেলেন পরপারে তৃপ্ত মুখে। একবার বৈশাখি ঝড়ে আম গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়লো। মা বললেন,তোদের দাদুর আত্মা মুক্তি পেলো। ওই ডালে বাঁধা ছিলো দাদুর মুক্ত হবার লাল চেলি। অবশ্য এটা ছিলো এক সাধুবাবার তুকতাক। বুড়ি ঠাকুমা সেদিন কেঁদে উঠেছিলো জোরে। ঠাকুমা বলে উঠলেন,চলে গেলো,ও চলে গেলো। কোনো কিছুই আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না। তবু কিছু ঘটনা বার বার তার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে নেয়। একটা দেশি কুকুর আমাদের বাড়িতে থাকতো ছোটে থেকে। তোমরা বিশ্বাস করবে

কি না জানি না? সে অমাবস্যা,পূর্ণিমায় কিছু খেতো না। রক্ষাকালী পুজোয় উপবাস করতো। তার সামনে খাবার দিয়ে দেখা গেছে সে খাবারের ধারের কাছে যেতো না। শুধু কথা বলতে পারতো না। কিন্তু ভাবে, ভঙ্গিমায় সব বেঝাতে পারতো মানুষের মতো। মা বলতেন,পূর্বজন্মে তোর সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা নিশ্চয় ছিলো। তাই তোর আমাদের বাড়িতে আগমণ। যেদিন জিম দেহ রেখেছিলো সেদিন ওকে মাটি চাপা দিয়ে ধূপ আর ফুলে শেষ বিদায় জানিয়েছিলো সারা পাড়ার বাসীন্দা। তাহলে কি বলবে তুমি এই ঘটনাকে। কোন যুক্তিতে অস্বীকার করবে তার সারা জীবন ধরে পালন করা ব্রত,উপবাস। বলবে,কাকতালীয়। সেসব তো এক আধবার হয়। সারাজীবন ধরে নিয়মিত হয় না। ছোটছেলে নন্তু বা বড়ছেলে সন্তুর কাছে তাদের মা থাকে না।মা, কুসুম থাকেন তার মেয়ে সুমনার বাড়িতে।জামাই খুব ভাল। কুসুমের ছেলের বউরা কুসুমকে ভালোবাসে না।ঝিয়ের মত কাজ করেও তাদের মন পায় নি।তাই বিনা বাক্যব্যায়ে চলে এসেছে সুমনার বাড়ি।কুসুমের স্বামী নেপালবাবু মারা গেছেন।কুসুমের মনে পড়ে তার ছোটবেলার কথা।চোদ্দ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল। তখন থেকেই তার স্বাধীনতা ডোবাপুকুরের শানবাঁধানো সিঁড়িতে থমকে গিয়েছিল। তবু তার ছোট পিসির প্রশ্রয়ে দরজাঘাটে তাল কুড়োনোর বেলা, ঘেটো রুই ধরার পালা, মাকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছিল। কিছুটা ডানা মেলে ওড়া,কিছুটা বাবার বাড়ির স্বাদ। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মত মা নতুন পুকুর সাঁতরে এপাড় ওপাড় হত। শাড়ি পরে কুসুমের সাঁতারকাটা দেখে দেওর আর ননদ অবাক হত। তারাও তার পিঠে চেপে সাঁতার শিখত। দেবর আর ননদের মাতৃস্নেহের অভাব কুসুম অনেকটা পূরণ করে দিয়েছিল।কুসুমের ননদ বলত,আমার মায়ের মত বৌদি আমাদের মানুষ করে তুলেছেন সন্তানের আদরে। অভাবের ঘরে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তবু বাবা হাসিমুখে বৌদির হাতের রান্না তৃপ্তি করে খেতেন। সকলকে খাওয়ানোর সময় বৌদির খেয়াল থাকত না নিজের খাওয়ার কথা। বাবা বলতেন,তোমার ভাত কই? কুসুম হাসিমুখে জল খেয়ে দুপুরে মাটির দোতলা ঘরে

বিশ্রাম নিত। এরকম কত রাত দিন যে কেটেছে তার ইয়ত্তা নেই। তবু হাসিমুখে বৌদি আমার সংসারের সমস্ত কাজ সেরে বর্ষার উদ্দামতায় সাঁতরে পেরোতেন সংসার নদীর এপাড়, ওপাড়। তারপর একদিন ঘোর অমাবস্যায় ঢেকে গেল বৌদির অন্তর দাদার মৃত্যুতে। বাবাও চলে গেলেন। বৌদি আর সাঁতার কাটেন না। তালপুকুরে তাল পচে যায়। ঘেটো রুই ঘাটে আসতে ভুলে যায়। না হেঁটে বৌদির পায়ের জোর কমে যায়। এখন মেয়ের আশ্রয়ে তাঁর সংসার নদী পারাপারের একান্ত সাধনায় স্মৃতিগুলোই হাতিয়ার।

কুসুমের মেয়ে সুমনার একটিমাত্র ছেলে। তার নাম সুজয়।সুজয় এখন বড় হয়েছে। সুজয়,অনর্থক, বেশি কথা বলতে পারে না।চুপ করে কানে হেডফোন গুঁজে মোবাইলে মগ্ন থাকে।ধরণী চুলোয় যাক।ওদিকে কর্ণপাত না করে স্বার্থপরের মত চুপ করে থাকে সুজয়।অনেকে ওকে পরামর্শ দেয় কথা বলার জন্য। ও শোনে না। সুজয় ছোটবেলায় খুব কথা বলত।অনর্গল বকে যেত খেলার মাঝে,পড়ার মাঝে।তারপর সংসারের অশান্তি দেখতে দেখতে বড় হওয়া।মাকে মার খেতে দেখত চুপ করে, কারণ প্রতিবাদ করবে কার বিরুদ্ধে? সবাই যে বড্ড আপন তার।সুজয় কথা বলে না,প্রতিবাদ করে না।নিজের চাওয়া পাওয়া সব হারিয়ে ফেলে মনের জট পাকিয়ে। সুজয় একবার তার বাবাকে বলেছিল, বাবা আমাকে একবার সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে চল।তাহলে আমি স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারব।তার বাবা বলেছিলেন,ওটা আমার ওপরে ছেড়ে দে।আমি দেখছি তোর সমস্যাটা।তারপর থেকে তার বাবা প্রচুর কথা বলতেন সুজয়ের সঙ্গে।বেড়াতে যেতেন,সেলফি তুলতেন সুজয়ের সঙ্গে।সুজয় ছন্দে ফিরছিল একটু একটু করে। এখন সে বেড়াতে যায় বন্ধুদের সঙ্গে,সেলুনে চুল কাটে,বাজারহাট করে,বাড়ির অনেক কাজ করে।তারপর কারও ডিস্টার্ব না করে কানে হেডফোন গুঁজে গান শোনে।

সুজয়ের সঙ্গে সহজ ভাবে মেশেন তার মা,সুমনা। সুমনা বলেন,মনের জোর কোনদিন হারাতে নেই।এবার তোকে চাকরি খুঁজতে হবে,বিয়ে করে সংসারী হতে হবে।তুমি বড় হয়েছ।এবার সংসারের দায়ীত্ব তোমার উপরেই বর্তাবে।

সুজয় কম্পিউটার ঘাঁটে, চাকরির সন্ধান করে।কিন্তু চাকরি পায় না।সে টিউশানি করতে শুরু করে। হাতে নগদ টাকা আসে। নিজের খরচটা চলে যায়।কিন্তু তার বাবা বলেন,নগদ টাকা হাতে আসতে শুরু করলে পড়াশোনা শিকেয় ওঠে।সুজয় এম,এ পড়ছে।কম্প্লিট করতে এখনও একবছর বাকি।তার বাবা বলেন,পড়াশোনা করার সুযোগ কিন্তু আর পাবি না। সংসারে ঢুকলে সময় পাওয়া বড় দুস্কর।

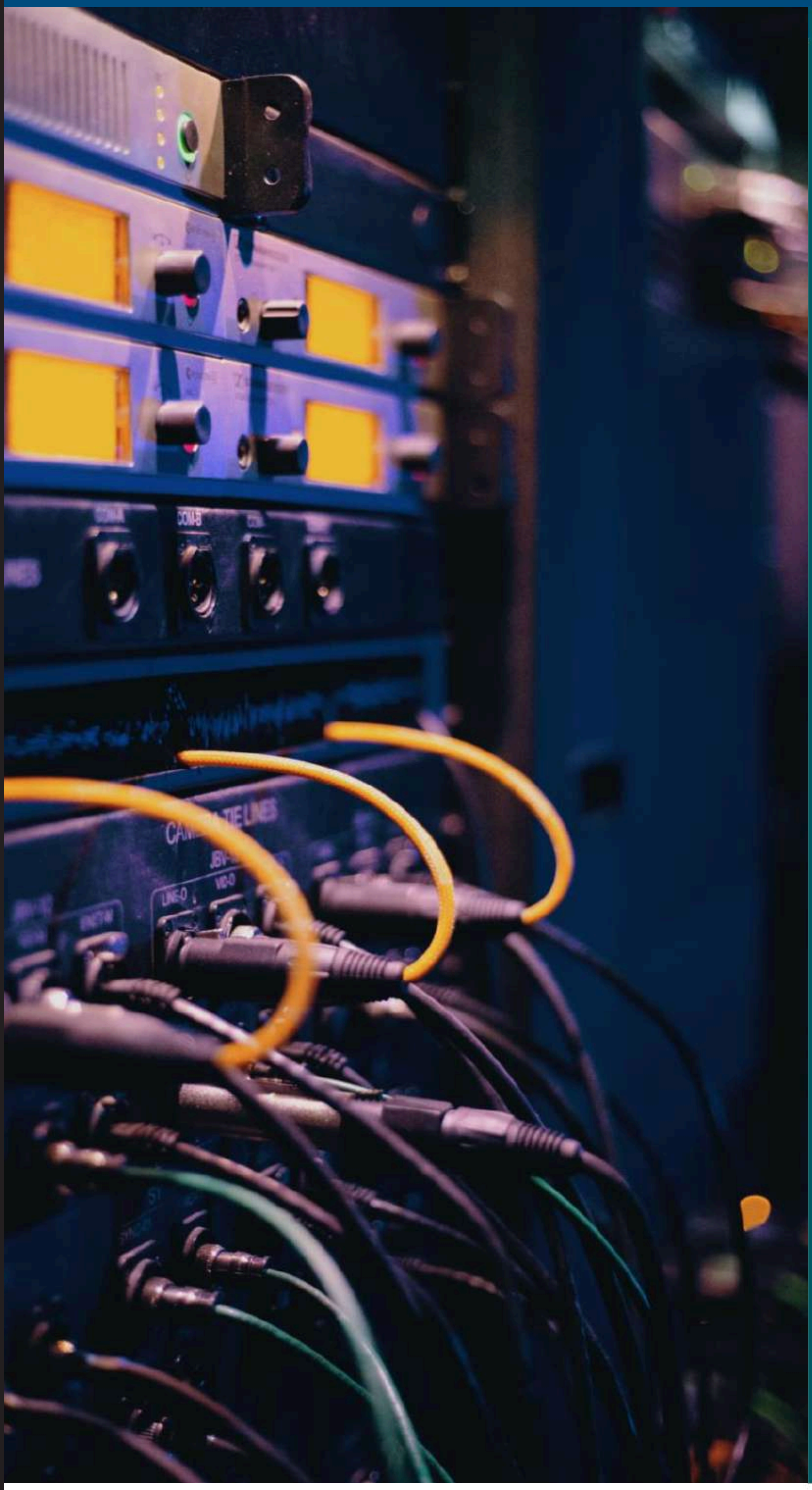
সুজয় ভাবে,কি হবে এম,এ পাশ করে।এখন একটা চাকরির তার খুব প্রয়োজন।

২০০৫ সালে একটা বন্যা হয়েছিল অজয় ও ঈশানী নদীর মিলিত জলস্রোতে।ডিভিসি থেকে জল ছাড়া ও অবিরাম বৃষ্টির ফলে এই বৃষ্টি। সেই বন্যায় কতলোক খেতে না পেয়ে শহরে চলে গেছে। কেউ কেউ আবার নিজেকে বিক্রি করেছে দালালের হাতে। তারা শরীর বিক্রি করে পেট চালাত।সবরকমের মানুষ নিয়ে এই উপন্যাসের বিষয়।গ্রামের নাকুদাদু আমাদের রামায়ণের গল্প শোনাতেন,তিনি বলতেন, অযোধ্যার রাজা দশরথের কনিষ্ঠা মহিষী সুমিত্রার দুই যমজ পুত্র হলেন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। তিনি রামের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। বিশ্বামিত্র রাক্ষসবধের জন্য রামকে আমন্ত্রণ জানালে লক্ষ্মণ তার সঙ্গী হন।পরবর্তীকালে তিনি রামকে পিতার আদেশের বিরুদ্ধে বনগমনে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু রাম বনবাসে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকলে, লক্ষ্মণও তার সঙ্গে বনে যান। বনবাসকালে তিনি একাধারে রামের ভাই, বন্ধু ও সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন।লঙ্কার যুদ্ধে তিনি রাবণের পুত্র মেঘনাদকে বধ করেন। বনবাসের শেষে রাম অযোধ্যার রাজা হলে লক্ষ্মণ তার মন্ত্রী নিযুক্ত হন।উত্তরকাণ্ডে রাম সীতাকে নির্বাসিত করলে, লক্ষ্মণ তাকে বাল্মীকির তপোবনে রেখে আসেন।রামচন্দ্র যখন কালপুরুষের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষীর ভূমিকা পালন করেন। এই সময় দুর্বাশা ঋষি রামের সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে, তিনি কাউকে রামের কাছে যেতে না দেওয়ার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে দুর্বাসাকে রামের কাছে নিয়ে যান। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধে

রাম তাকে পরিত্যাগ করলে, তিনি সরযূ নদীর তীরে যোগাবলম্বে দেহত্যাগ করেন।লক্ষণ হলেন এমন এক মহাপুরুষ যিনি মহাপরাক্রমশালী মেঘনাদকে বধ করেন। মেঘনাদের এমন বর ছিল যে, যে ব্যক্তি ১৪ বছর না খেয়ে, না ঘুমিয়ে ব্রহ্মচর্য্য পালন করবেন তিনি শুধু মেঘনাদকে বধ করতে পারবেন। বনবাসের সময় ১৪ বছর শ্রীরামের ভ্রাতা লক্ষণ এই মহা কঠিন কার্য্য ও শক্তি অর্জন করেন, ফলস্বরূপ তিনি রামায়ণের যুদ্ধে রাবণের পুত্র মেঘনাদকে বধ করেন।লক্ষ্মণ সীতার কনিষ্ঠা ভগিনী ঊর্মিলাকে বিবাহ করেছিলেন। তার দুই পুত্রের নাম ছিল অঙ্গদ ও ধর্মকেতু।কথিত আছে, লখনউ শহরটি বর্তমান উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের রাজধানী লক্ষ্মণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

টোটন,রমেন,বৃষ্টি ও আরও অনেকে নাকুদাদুর কাছে তরণীসেনের গল্প শুনেছিলাম।তরণীসেনের কাহিনী শুনে আমরা কেঁদে ফেলেছিলাম প্রথমে।নাকুদাদু বলেছিলেন, বিভীষণ লঙ্কাপুরী ত্যাগ করলেও তার স্ত্রী সরমা ও পুত্র তরণীসেন লঙ্কাপুরীতেই অবস্থান করেছিলেন।তরণীসেনের বয়স তখন বারো বছর। তরণীসেনের কাছে সংবাদ গেল যুদ্ধে রাক্ষসবাহিনীর পরাজয়ের কথা,লঙ্কার বীরদের আত্মত্যাগের কথা। সে তখন রাবণের দরবারে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করে।রাবণ বালক তরণীকে কোনোমতে এই ভয়ংকর যুদ্ধ তে যাওয়ার অনুমতি দিতে চাইলেন না। কিন্তু তরণীসেন রাবণকে রাজি করিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তরণী ছিল পিতা বিভীষণের মতই ধার্মিক।সে তার রথের চূড়ায় রামনাম খচিত পতাকায় শোভিত করল। নিজের সারা অঙ্গে রাম নাম লিখে নামাবলি গায়ে দিয়ে রথে উঠে বসল । রথ ছুটে চলল যুদ্ধের ময়দানে ।রাম তাকিয়ে দেখেন রামনাম খচিত ধ্বজাধারী রথের উপর দ্বাদশ বর্ষীয় বালক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। রাবণের এহেন বিবেচনা দেখে রাম বিস্মিত হলেন।তার গায়ে রাম নামের নামাবলি জড়ানো।রাম বিভীষণকে বললেন--ওহে মিত্র বিভীষণ !কে এই বালক?সর্বদা মুখে রাম নাম জপ করছে।আমি কি করে এর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করি।তখন বিভীষণ তরণীর আসল পরিচয় রামকে বললেন না।বিভীষণ বললেন এ দূরন্ত রাক্ষস।হে প্রভু রাম এ রাক্ষসের

ONECOOP BROADBAND SOLUTIONS PVT LTD



About Us

OneCoop Broadband is a Class 'B' ISP and IT Consulting Company based in the Kolkata city of West Bengal State. The company started in 2024 and is one of the most influential companies within the Fortune 250 LCO and Company today. One Coop Broadband is the ISP and IT Consulting Company at Number 4 all over State.

Our Services

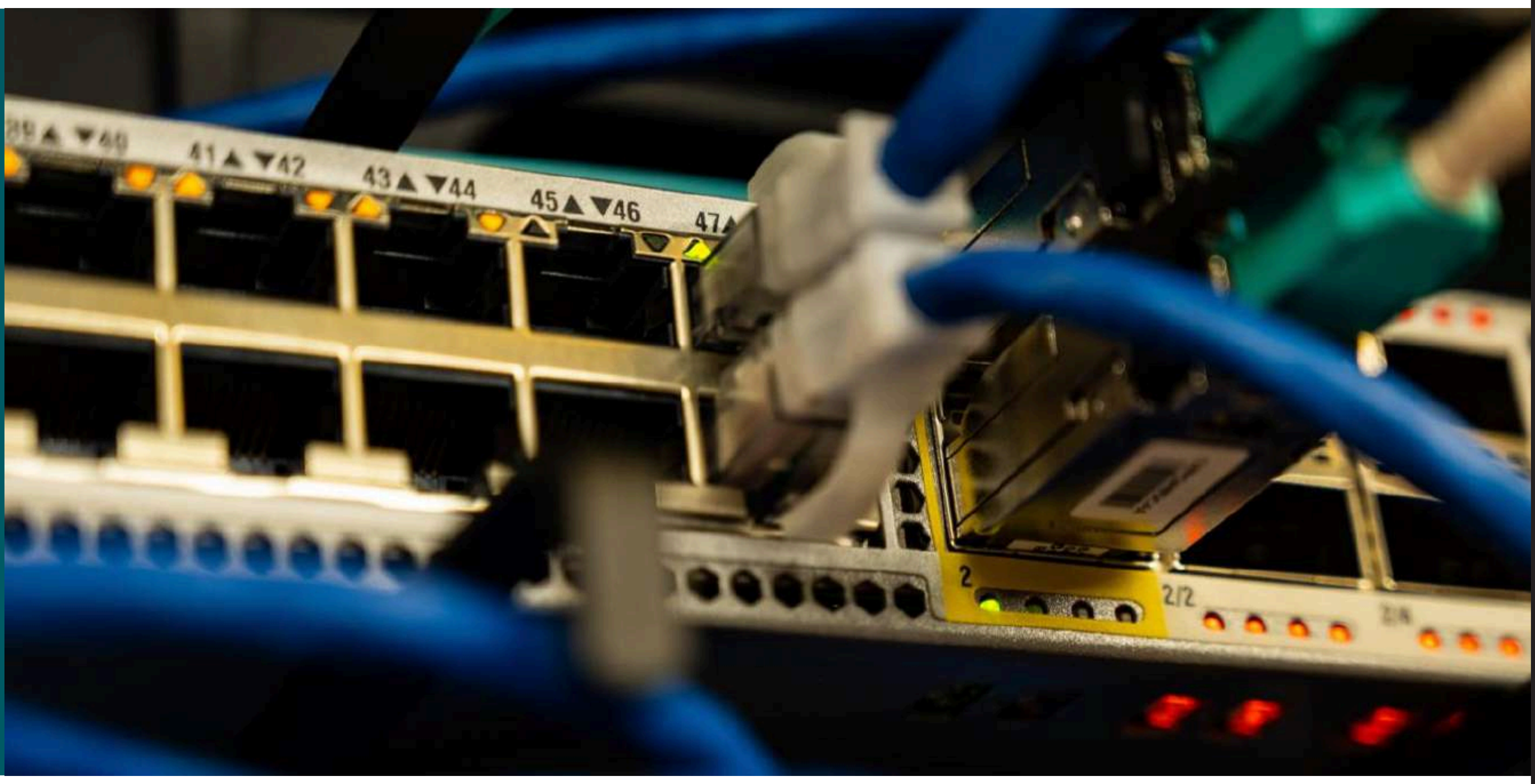
System Analysis

OneCoop Broadband helps to upgrade and improve the current Systems of the company by providing credible and professional analysis.

Upgrade Installation

After the Analysis, the staff at OneCoop Broadband will help you install these upgrades to ensure that they are within the current business world standards.

EXPAND YOUR BUS INESS WITH US!
(WELCOME LCO)



Send a Message Today!
+91 91237 61997 | onecoopbroadband@gmail.com
Martin Burn i-Space~~, DH-6/35, Opp Unitech Gate No~~. 2,
Rajarhat, New Town, DH Block, Kolkata, 700156, WB

প্রতি তুমি বৈষ্ণব অস্ত্র নিক্ষেপ কর।তাহলেই এ রাক্ষসের মৃত্যু হবে।তরণীসেনকে লক্ষ্য করে রাম বাণ নিক্ষেপ করলেন। তরণী জয় রাম জয় রাম বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বিভীষণ তরণীর প্রাণহীন দেহ কোলে তুলে হাহুতাশ করে কেঁদে উঠলেন। রাম বিভীষণকে ভর্ৎসনা করলেন এবং তরণীকে আর্শীবাদ করলেন।তরণী রাক্ষস দেহ পরিত্যাগ করে দিব্যদেহ ধারণ করে বৈকুন্ঠে চলে গেল। পূর্ববর্ধমান জেলার দশ বারোটা গ্রাম নিয়ে নবগ্রাম অঞ্চল।এইস্থানে আমাদের জীবন কাটে হাসি কান্নায়, সুখেদুঃখে।

গ্রামে থাকলেও আমরা মধ্যবয়সে জাপান গেছিলাম বন্ধুরা সকলে একত্রে।শেষ থেকেই শুরু করি গল্পটা। আমাদের ছোটবেলার বন্ধু বিশু একবার জাপান , ঘোরার আবেদন করল বন্ধু কমিটিকে। রমেন বললো, খরচ অনেক। আদৃজা বললো, এক একজনের বিমানে আসা যাওয়া হাজার হাজার টাকার ব্যাপার। বিশু বললো, আমাদের বন্ধুদলের কোঅপরাটিভে অনেক টাকা জমেছে। পাঁচবছর কোথাও যাই নি আমরা। এবার টাকাগুলো একটা দেশ ভ্রমণে খরচ হবে আর বাকিটা দান করা হবে, গরীবদের, ফিরে এসে।বিশুর মুখের উপর আমরা কেউ কথা বলি না। তার কথাই ফাইনাল হলো। আদৃজা, রমেন, বিরাজুল, বিশু ও আমি দমদমে পৌঁছে গেলাম এক শুভদিন দেখে সকালবেলা। অবশ্য আগে থেকে ভ্রমণ সংক্রান্ত ভিসা সমস্যা ও আনুষঙ্গিক আইনি কাজ মিটিয়ে নিয়েছে বিশু। বিশু লাগেজগুলো একসঙ্গে বিমানবন্দরে ট্রলারে চাপিয়ে পৌঁছে গেল ওয়েটিং রুমে। চেকিং পর্ব সেরে আমরা নিশ্রাম নিচ্ছি। হঠাৎ গোপাল ভিন্ডার সঙ্গে দেখা। আমাদের রাজস্থানী বন্ধু। একসাথে আমরা মেসে ভাড়া থাকতাম কলকাতার আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে। গলির ভেতরে ভাঙ্গাচোরা, স্যাঁতসেতে এক ভুতুড়ে বাড়িতে আমরা থাকতাম কয়েকজন বন্ধু। গোপাল বললো, ক্যায়সা হো তুমলোগ?বিশু বললো, বাড়িয়া ভাইয়া। আপলোগ ঠিক হো তো। গোপাল ভিন্ডা, আমাদের সকলকে কফি খাওয়ালো। কফি পানের পরে বিদায়পর্ব। আমাদের বিমান ছাড়ার সময় হয়েছে। গোপাল এখানে কাজ করে। সে সবকিছু ঠিকমত বলে আমাদের অসুবিধা দূর করলো।বিমানে আদৃজা বিশুকে ভিসা সম্পর্কে কিছু

তথ্য জানতে চাইলো। বিশু বললো,ভারতীয়দের ভিসা লাগে ইউরোপীয় দেশগুলো ভ্রমণের ক্ষেত্রে। আশা করি সবদেশেরই হয়ত লাগে। ভিসা-মুক্ত বা আগমনের পর ৪৯ টি দেশে ভিসা প্রাপ্তির ভিত্তিতে বৈশ্বিকভাবে ভ্রমণ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান ভালো। ভারতীয়রা বিভিন্ন দেশে অবৈধভাবে পাড়ি জমায় বিশেষভাবে ইউরোপ-আমেরিকাতে, সেইজন্যে ভারতীয়দের ক্ষেত্রে ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণে কড়াকড়ি আরোপ করা আছে। ৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখ থেকে ভারতীয় টুরিস্ট এবং ব্যবসায়ীরা বা চিকিৎসা সেবা নিতে ইচ্ছুক মানুষরা রাশিয়াতে ভিসা ছাড়াই যেতে পারবে। ভারতীয় ভ্রমণকারীদের ভূটান এবং নেপাল ছাড়া অন্য রাষ্ট্রে ভ্রমণকালে অপরিশোধযোগ্য কাজে লিপ্ত হতে হলে একটা ভিসা বা কাজের স্বীকৃতিপত্র নিতে হয়। রাজ্যের বাসিন্দা নয় এমন ভারতীয় নাগরিকদের জন্য এইসব রাজ্যে ভ্রমণকালে ইনার লাইন পারমিট (ILP) নিতে হয়। আইএলপি অনলাইন বা এইসব রাজ্যের বিমানবন্দর সমূহ থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।বিরাজুল বললো, এত খুঁটিনাটি আমরা জানতে পারি না কেন?

৬

কবি বলেন, জানতে হয় না হলে পিছিয়ে পড়তে হয়।
বন্ধু সন্তু বলে, আমরা জাপানের টোকিও -র চিবা বিমানবন্দরে নেমে একটা গাড়িতে করে খোঁজ নিয়ে চলে এলাম হোটেলে। বিশাল হোটেল তেমনই তার সুব্যবস্থা। রমেন বলল উদীয়মান সূর্যের দেশে আমরা এলাম। এ আমার কল্পনার বাইরে ছিলো। বিরাজুল ও আদৃজা বললো, খুব ঘুরবো কয়েকদিন। সন্তু বলে,জাপান দেশের বিবরণ কিছু দিতে পারবি। আসার আগে পড়াশুনা করেছিস কিছু। বিরাজুল বললো, জানি অল্প। তবে বিশু আছে। ও একাই একশ।আমরা সকলে বললাম, তা বটে তা বটে। একদম হককথা কইছে বিরাজুল। বিশু বললো, পূর্ব এশিয়ার একটি দ্বীপ রাষ্ট্র হল জাপান । এই দেশটি প্রশান্ত

মহাসাগরের বুকে জাপান সাগর, পূর্ব চীন সাগর, চীন, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও রাশিয়ার পূর্ব দিকে উত্তরে ওখোৎস্ক সাগর থেকে দক্ষিণ পূর্ব চীন সাগর ও তাইওয়ান পর্যন্ত প্রসারিত। যে কাঞ্জি অনুসারে জাপানের নামটি এসেছে, সেটির অর্থ "সূর্য উৎস"। জাপানকে প্রায়শই "উদীয়মান সূর্যের দেশ" বলে অভিহিত করা হয়।জাপান একটি যৌগিক আগ্নেয়গিরীয় দ্বীপমালা। এই দ্বীপমালাটি ৬,৮৫২টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। জাপানের বৃহত্তম চারটি দ্বীপ হল হোনশু, হোক্কাইদো, ক্যুশু ও শিকোকু। এই চারটি দ্বীপ জাপানের মোট ভূখণ্ডের ৯৭% এলাকা নিয়ে গঠিত। জাপানের জনসংখ্যা ১২৬ মিলিয়ন। জনসংখ্যার হিসেবে এটি বিশ্বের দশম বৃহত্তম রাষ্ট্র। জাপানের রাজধানী টোকিও শহরের জনসংখ্যা প্রায় ৯.১ মিলিয়ন। এই শহরটি অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার ২য় বৃহত্তম মূল শহর। টোকিও ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাজ্য নিয়ে গঠিত বৃহত্তর টোকিও অঞ্চলের জনসংখ্যা ৩৫ মিলিয়নেরও বেশি। এটি বিশ্বের বৃহত্তম মহানগরীয় অর্থনীতি।সন্তু বলে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা সাগালিন দ্বীপের কথা বলেছিলেন। মনে আছে তোর বিশু। বিশু বললো, জাপানের সাগালিন এবং ওহোতস্ক সমুদ্র দ্বারা সাখালিনটি ধুয়ে ফেলা হয়, এটি জাপান থেকে লা পেরুজের তলদেশে তাতার তীর দ্বারা মহাদেশ থেকে পৃথক হয়। সাখালিনের মোট এলাকা ৭৬ হাজার বর্গ কিমি। এবং ফর্ম, এটি একটি মাছ অনুরূপ, এশিয়ার তীরে বরাবর প্রসারিত। দ্বীপটির দক্ষিণে, পাহাড়গুলি আয়ত্ত করে, উত্তরের কাছে, তাদের নিম্নভূমি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, এবং শুধুমাত্র শ্মিট্ট উপদ্বীপে, সাখালিনের চূড়ান্ত উত্তর দিকটি হ'ল পাহাড়ের শিখরগুলি আবার দৃশ্যমান। যেমন একটি জটিল ত্রাণ, পাশাপাশি সমুদ্র এবং সমুদ্রের নিকটবর্তী, উদ্ভিদ এবং প্রাণী বিশ্বের মৌলিকত্ব নির্ধারিত।সাখালিন বৃহত্তম রাশিয়ান দ্বীপ। জাপানীরা এই দ্বীপটি করাফুতোকে উপভোগ করে, যার অর্থ "ঈশ্বরের ভূমি মুখ।" দ্বীপটি ১৬৪৩ সালে ডাচম্যান দে ভ্রিসের আবিষ্কৃত হয়েছিল। সম্ভাব্য কারণ দ্বীপটি মূল ভূখন্ড থেকে পৃথক হওয়ার স্রোত শীতে ঠান্ডা হয়।জাপানের সাগালিন এবং ওহোতস্ক সমুদ্র দ্বারা সাখালিনটি ধুয়ে ফেলা হয়, এটি জাপান

থেকে লা পেরুজের তলদেশে তাতার তীর দ্বারা মহাদেশ থেকে পৃথক হয়। সাখালিনের মোট এলাকা 76 হাজার বর্গ কিমি। এবং ফর্ম, এটি একটি মাছ অনুরূপ, এশিয়ার তীরে বরাবর প্রসারিত। দ্বীপটির দক্ষিণে, পাহাড়গুলি আয়ত্ত করে, উত্তরের কাছে, তাদের নিম্নভূমি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, এবং শুধুমাত্র শ্মিট্ট উপদ্বীপে, সাখালিনের চূড়ান্ত উত্তর দিকটি হ'ল পাহাড়ের শিখরগুলি আবার দৃশ্যমান। যেমন একটি জটিল ত্রাণ, পাশাপাশি সমুদ্র এবং সমুদ্রের নিকটবর্তী, উদ্ভিদ এবং প্রাণী বিশ্বের মৌলিকত্ব নির্ধারিত।কারণ সাখালিন তাহা তার প্রজাতি বৈচিত্র্যের মধ্যে রাশিয়াতে সবচেয়ে ধনী।

কবি বলে,পৃথিবী একটা ছোট শহরের নাম । তার সব খবর জানা কঠিন। আর মহাকাশ বা ব্রম্ভান্ডের কথা বাদই দিলাম। অসীম এই মহাকাশ। কত বিচিত্র। তার কিছুই কি আমরা জানি? নিজেকে খুব বোকা লাগে যখন জ্ঞানের অহংকারে মত্ত হয়ে আস্ফালন করি ডাঁহা আহাম্মকের মত।

৭

রসচক্র ও মাধবের কথা:

কালিদাস ‘রসচক্র’ নামে একটি সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং রবীন্দ্র-ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে তিনি কাব্যচর্চা শুরু করেন। রোমান্টিকতা, প্রেম, পল্লিজীবন, সমাজ, ঐতিহ্যপ্রীতি এবং বৈষ্ণবভাব তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়। তাঁর মোট কাব্যগ্রন্থ ১৯টি; তন্মধ্যে কুন্দ (১৯০৭) তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য। এ ছাড়া পর্ণপুট (১৯১৪), ঋতুমঙ্গল (১৯১৬), রসকদম (১৯২৩), হৈমন্তী (১৯২৪), লাজাঞ্জলি, ব্রজবেণু (১৯৪৫), চিত্তচিতা, পূর্ণাহুতি (১৯৬৮) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। তিনি কালিদাসের শকুন্তলা, কুমারসম্ভব এবং মেঘদূতের অনুবাদ করেন। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, পদাবলী সাহিত্য, শরৎ-

সাহিত্য ও সাহিত্য প্রসঙ্গ তাঁর সমালোচনা গ্রন্থ। তাঁর রচিত শিশুতোষ গল্পকাহিনীও আছে। ‘বেতালভট্ট’ ছদ্মনামে রচিত তাঁর রম্যরচনাগুলি পাঠকসমাজে খুবই সমাদৃত হয়েছে।সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ কালিদাস বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তিনি রংপুর সাহিত্য পরিষদের ‘কবিশেখর’ উপাধি (১৯২০), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জগত্তারিণী স্বর্ণপদক’ (১৯৫৩) ও ‘সরোজিনী স্বর্ণপদক’, বিশ্বভারতীর ‘দেশিকোত্তম’ উপাধি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ (১৯৬৩) এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডিলিট ডিগ্রি (১৯৭১) লাভ করেন।

১৯১৩ সালে রংপুরের উলিপুর স্কুলের সহশিক্ষক হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু হয়। পরে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন সাত বছর। তারপরে (১৯২০-৩১) দক্ষিণ চবিবশ পরগনার বড়িশা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করার ১১ বছর পর রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের সহায়তায় তিনি কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনের ভবানীপুর শাখায় সহকারী শিক্ষকরূপে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।আমদের গ্রামের গর্ব কবিশেখর,বলল তার বন্ধু সন্তু ।সে সকালে উঠেই পুরোনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে দোকানের পাশের ছেলেটাকে বলছে, পোষোলা করতাম পৌষ মাসে। অজয় নদী যেখানে 'এস' এর বাঁক নিয়েছে ইংরেজি অক্ষরের মতো। সেখানে বন্ধু, বান্ধবী একসাথে পোষল্যা করতে যেতাম শীতকালে পৌষ মাসে। নদীতে চান করতাম। বাড়িতে নিষেধের বেড়া। বাঁধা গরু ছাড়া পেলে যখন পাগলের মতো ছুটে ছুটে বেড়ায় স্বাধীনতার আনন্দে, ঠিক তেমনই আমরাও কী করবো ভেবে পেতাম না। শুধু খেলা, ছোটা আর উল্টোপাল্টা চিৎকার চেঁচামেচিতে নদী উচ্ছল হতো। প্রতিধ্বনি ফিরে ফিরে আসে বারে বারে। এত খোলা জায়গা, এত আকাশ, নদী, জল আমরা সহজে তো পাই না। তাই মুহর্তের আনন্দ আজও হৃদয়ে রং ধরায়, চোখ ভেজায় নব আনন্দে। স্মৃতি রোমন্থনেও অনেক সুখ।

৮

নুর আলি ও অংশুমানের কথা:

কড়ুইয়ের পর সিঙ্গি গ্রামের দিকে কানি নদীর তীরে নেমে এলো সন্ধ্যা চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রকৃতি ছিল ঢাকা। কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু দেখা যায় আকাশের তারা, অগুন্তি তারা। তবু তার মধ্যেই চলে সময় প্রবাহ। আবার সকাল হয়। কলরবে মেতে যায়,গ্রাম। আর পাশের এলাকার গুমটিতে পুরুলিয়া মুসলমানের বসতি কম। তবু কেতুগ্রাম রাউন্দী এলাকায় মুসলমান বসতি আছে। বিভিন্ন গ্রামের মুসলমান পাইকার আসে। তারা ভুলকুড়ি, দক্ষিণ দিকে কোপা, কোমডাঙ্গা গ্রাম থেকে গরু ছাগল নিয়ে কেনাবেচা করে। এদিকে প্রবাহিত হয় অজয় নদ সময়ের তালে তালে। ফলে হিন্দু মুসলমান আত্মীয়-স্বজন এখানে। মুসলিম পাড়ার নদের জল মিলিত হয় হিন্দু পাড়ার নদের জলে। তারা একে অপরের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার সম্পর্কে।

খুব সুন্দর পরিবেশে বড় হয়েছে নুর আলি । আর   স্বপনও নুর আলির বন্ধু।

বাবার সঙ্গে ছোট থেকেই নুর আর স্বপন নিজেদের চাষের জমিতে যেত এবং চাষবাস দেখাশোনা করত। মধ্যবিত্ত পরিবার। অভাব থাকলেও সংসার চলে যায় কোন রকমে তাদের। সকালে মাঠে যাওয়ার পথে পা দিতেই স্বপনে ঘুম ঘুম ভাবটা কেটে গিয়ে চনমনে লাগে ঘড়িতে তখন বিকেল চারটে সমস্ত গ্রামটা যেন নিষ্পাপ শিশুর মত লাগে।স্বপন হালদার বয়স ২৫। গ্রাজুয়েট হয়েছে হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজ থেকে। টিউশানি করে চুটিয়ে। গ্রামে থেকে চাষবাস দেখাশোনা করা, টিউশনি করা তার পেশা। বাবা মারা গেছেন দু বছর আগে বাড়িতে মারছোট ভাই আছে।স্বপনের অনেক বন্ধুর মধ্যে কেতুগ্রামের নুর আলি অন্যতম প্রধান বন্ধু। বাড়ি আসে আবার সময় পেলে ওদের বাড়ি যায় স্বপন। আসলে নুর আলির বাবার বন্ধু ছিলেন স্বপনের বাবা। এইভাবে হিন্দু-মুসলমানের পরিবার বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। কবি নজরুল লিখেছিলেন, "আমরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।"স্বপন আজ খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে

মাঠে গিয়েছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি গান গাইতে। " যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু এ জীবনে" গাইতে গাইতে যাচ্ছিল! হঠাৎ মর্নিং ওয়াক করতে যাওয়া যদু মাস্টারের ১৯ বছরের মেয়ে তনুর সঙ্গে দেখা।সে বলল স্বপনদা মাঠে যাচ্ছ আজ একবার আমাদের বাড়িতে যেও ইংরেজিটা দেখিয়ে দেবে। বাড়িতে বাবা আছেন।বেগুনি আর মুড়ি খেতে খেতে স্বপন আর তনু কথা বলছিল। পাশের ঘরে তনুর বাবা-মা জানে ওদের প্রেমের কথা। ওদের দুই পরিবারের মধ্যে মিলনে কোন বাধা নেই। সকালে মুড়ি খাওয়ার পর হাত ধুয়ে তনু সামনে বসল বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে পনেরোই কার্তিক মাস। নদীর জলে ভরা ঢেউ লাগলো, কেঁপে উঠলো শরীর বাঁশি। দুজনেই বিয়ের আগেই মিলনের অপূর্ব স্বাদ মিটিয়ে নিল। বিধাতার খেলা। কখন যে কার কি হয় কেউ বলতে পারে না।সেদিনের সেই ঘটনার পরে স্বপন চাইছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়েটা সেরে ফেলতে। কারণ সাবধানতা অবলম্বন না করায় মা হওয়ার লক্ষন প্রকাশ পেল তনুর দেহে।বিয়ে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তনুর দাদু মরে যাওয়ায় বিয়ের দিন ঠিক হল এক বছর পরে। এদিকে তো চিন্তায় পরলো স্বপন আর তনু। স্বপন খুব ভোরে মাঠে গিয়েছে।নিজে গিয়ে জমিতে আল বেধেছে। অভ্যাস নেই। তবুও চেষ্টা করছে ।ঠিকই কিন্তু মুনিষ দিয়ে বেশিরভাগই কাজ করায়। কিন্তু ওর ইচ্ছে সব কিছু নিজে চাষ করে ফসল ফলানো।তার মজাই আলাদা।
কবি বলেন একমাত্র কৃষক ছাড়া কেউ তা অনুভব করতে পারে না। কৃষকের জয় হোক।সেনাবাহিনীর জয় হোক।

৯

কবির বন্ধু গৌতমের কথা:

গৌতমের জীবন।শুকনো জমির মত মনে ফাটাদাগ হয়ে আছে। কত চাকরির পরীক্ষা দেওয়ার পর গৌতম শেষঅব্দি রেলের ড্রাইভারএর চাকরিটা পেয়ে গেল। তার আগে সে লেদের নিজস্ব

কারখানা চালাত। কিন্তু আয় বিশেষ হত না। চলত না বললেই চলে।
বিভিন্ন কারখানায় গিয়ে অর্ডার নিত কাজের। ধীরে ধীরে অর্ডার আর পেত না।যাদের পাঁচ,দশটা লেদমেশিন আছে তারা অর্ডার পেত।কিন্তু গৌতমের মাত্র একটা লেদ।তার সারাজীবনের সঙ্গী ছিল, অনুপ।বাড়িতে তারা তিন ভাই, তিন বোন। বাড়িতে তার মর্যাদা ছিল না কারণ তিন ভাইয়ের মধ্যে দুই ভাই ভালো চাকরি করে। একমাত্র সেই বেকার ছিল। আজ তার মেজাজটা বেশ ফুরফুরে লাগছে। চাকরি পাওয়ার পর বাড়ির সকলের ব্যাবহার পাল্টে গেছে। বাড়ির সকলেই তাকে ডেকে কথা বলছে এবং খিদে পাওয়ার আগেই খাবার খেতে দিচ্ছে। এতদিন যেটা হয়নি। বেকার জীবনের অভিজ্ঞতা গৌতমের খুব খারাপ। তার মা বলতেন, মেলা বকবক করিস না বাড়িতে, বসে শুধু ফুটানি, কাজের বেলায় নেই শুধু উল্টোপাল্টা কথা আছে। ঝগড়া করা স্বভাব তোর। যা বাইরে যা।বাইরে চায়ের দোকানে, ওষুধের দোকানে আড্ডা মেরে খরখরে সময়ঘর ভাড়া অনেক বেশি তাই সে ৫ জনের সঙ্গে একটা মেয়ে সে ঘর ভাড়া নিল তাহলে তাহলে খাওয়া-দাওয়া টা ওখানে হবে এবং ঘরভাড়া টাও পাঁচ ভাগের পাঁচ ভাগ হবে তার ফলে খরচ কম হবে , কাটাত গৌতম। কদবেলের মত কঠিন সময়টা আজ গৌতমের কাছে গন্ধরাজ ফুলের মত লাগছে।ব্যাগ পত্র গুছিয়ে নিয়ে এসে ট্রেনিংয়ের জন্য চলে গেল খড়গপুর। খড়গপুরে। আপাতত তার ছয় মাস ট্রেনিং ট্রেনিং পিরিয়ড। এরপর সে ড্রাইভার হবে। খড়গপুরের একটা মেসেরবাড়ির একটা তক্তার বেড সে ভাড়ায় নিল এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সেখানেই হল। ট্রেনিং সেন্টারটা কাছাকাছি তার ফলে গৌতমের খুব সুবিধা হলো। সারাদিন ট্রেনিং করার পর বিকেল পাঁচটায় একটু ঘুরতে বেরোত।গৌতম জানে,পশ্চিম মেদিনীপুরে অবস্থিত, খড়গপুরে বিশ্বের দীর্ঘতম রেলপথ প্ল্যাটফর্ম এবং ভারতবর্ষের বৃহত্তম রেল কর্মশালা আছে। খড়গপুরের কলাইকুন্ডায় দেশের প্রথম ভূতল বায়ু সেনাবাহিনীর ঘাঁটি আছে এবং আরেকটি বায়ু সেনাবাহিনীর ঘাঁটি সউলায় অবস্থিত।ঘুরতে ঘুরতে তার দুজন যুবকের সঙ্গে পরিচয় হলো।

তারাও রেলের ড্রাইভার এর চাকরি পেয়ে ট্রেনিং নিচ্ছে এবং তারা একটু দূরেই, ঘর ভাড়া করে আছে। গৌতম খুব জ্যোতিষী বিশ্বাস করে জ্যোতিষশাস্ত্রের অভিজ্ঞ লোক বলেছিলেন, তুমি যেখানেই যাবে তোমার কোন সাহায্যকারী জুটে যাবে। কারণ তোমার বৃহস্পতির অবস্থান, অত্যন্ত সবল।

বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্ছেন গৌতম। হঠাৎ একদিন মোবাইলে ফোন এলো, তার বাবা অসুস্থ এখনই তাকে বাড়ি যেতে হবে। খবর নিয়ে জানল, ট্রেনিংয়ের সময় ছুটি নিলে নিজেরই অসুবিধা হবে।ট্রেন চালানোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেকজীবন।ট্রেনিংয়ে গাফিলতি করা যাবে না।

গৌতম মোবাইলে ফোন করে বাবার খবর নিল।

সে বলল তার মাকে, বাবা কেমন আছেন? মা ট্রেনিং এর সমশযে ছুটি নিলে অসুবিধা হবে।কারণ একজনের জন্য ট্রেনিং থেমে থাকবে না।

সে যেতে পারবেনা একথা বাড়িতে জানিয়ে দিল। কয়েকদিন পরে মেসবাড়িতে কড়কনাথ মুরগি রান্না হলো। কড়কনাথ মুরগির কথাটা সে জানত না। এখানে কড়কনাথ মুরগির খুব প্রচলন এবং সুখ্যাতি। গৌতম মেসের মালিককে কড়কনাথ মুরগি সম্বন্ধে জানতে চাইল।মেসের মালিক বললেন, কড়কনাথ মুরগির পালক থেকে শুরু করে ঠোঁট, পা, নখ, ঝুঁটি, চোখ, সবটাই কালো। এমনকী, ওই মুরগির মাংস ও হাড়ের রংও কালো। যে কারণে অনেকেই খেতে পছন্দ করেন না, কিংবা পচা মাংস ভেবে এড়িয়ে যান। কিন্তু জানেন কি, পৃথিবীর সমস্ত প্রজাতির মুরগির মধ্যে এই কুচকুচে কালো বর্ণের মুরগিই সবচেয়ে দামি। উপকারিতার দিক থেকেও এগিয়ে এটি। রীতিমতো ঔষধি গুণসম্পন্ন এই মুরগির মাংসে চর্বি প্রায় নেই বললেই চলে। উল্টে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও অন্যান্য খাদ্যগুণ। এবার নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন? তবে চলুন জেনে নেওয়া যাক কড়কনাথ মুরগি মাংস খাওয়ার স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে।এটি ভারতের একমাত্র কৃষ্ণ বর্ণের মাংসের মুরগি। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, সাধারণ মুরগির তুলনায় এর মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিডের মাত্রা বেশি হলেও কোলেস্টেরলের পরিমাণ খুব কম।এটি নেটিভ বা বয়লার মুরগির

চেয়ে অনেক স্বাদযুক্ত। এটি মধ্য প্রদেশের ঝাবুয়া জেলায় পাওয়া যায়, যেখানে এটি ‘কালীমাসি’ নামে পরিচিত। কড়কনাথ মুরগির মাংস, ডিম, এবং দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই কালো। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন। সাথে ফ্যাটও খুব কম থাকে। সুতরাং এটি হার্টের রোগী এবং ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী। এটি মূলত মধ্য প্রদেশের ঝাবুয়া জেলার উপজাতি অঞ্চলে পাওয়া যায়। তবে এখন ছত্তিশগড়, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের মতো অনেক রাজ্যে কড়কনাথ মুরগির এই জাতটি পাওয়া যাচ্ছে। সারাদেশে এই মুরগির চাহিদা রয়েছে বেশ। এর আবার তিনটি প্রজাতি রয়েছে যার মধ্যে জ্যাড ব্ল্যাক, পেনসিল্ড এবং গোল্ডেন কড়কনাথ রয়েছে। জেড ব্ল্যাকের ডানা পুরোপুরি কালো, পেন্সিল কড়কনাথের আকার পেন্সিলের মতো। গোল্ডেন কড়কনাথের ডানাগুলিতে সোনালি বর্ণের দাগ রয়েছে।গৌতমের জীবনটা পাক খেয়ে গেল হঠাৎ। সে মোবাইলে আবার খবর পেল বাবা মারা গেছেন দুদিন আগে। তার মনটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠ। সে একটা ইস্তফাপত্র দিয়ে চাকরি ছেড়ে একদম সোজা বাড়ি চলে গেল। বাড়িতে মা বকাবকি করলেন।তিনি বললেন, এই যুগে একটা চাকরি পাওয়া যায় না, আর তুই রেলের চাকরি ছেড়ে চলে এলি। তোর মত বোকা পৃথিবীতে আর দুটো নেই। এত বোকা তুই এবার বসে বাড়িতে বসে পচে মর।তারপর বাবার শ্রাদ্ধ হয়ে গেলে গৌতম কড়কনাথ মুরগির ফার্ম করল।এই মুরগীর ব্যাবসা করে কতজন ধনী হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।গৌতম ভাবে,আমরা শুধুই চাকরগিরি করার জন্য জন্মায় নি।আমি ব্যাবসা করে ধনী হব।তারপর পাঁচবছরের মধ্যে গৌতম শহরের অন্যতম ধনীলোক হয়ে উঠল।তার মা বললেন,আমি জানতাম, তুই একদিন ঠিক বড় হবি।ছরে পা দিয়েছে। সে বসে বসে এইসব ভাবছে। এখন নন্দনপাড়ে বাস।

১০

কবির বান্ধবী কুসুম এখনও মেয়ে সুমনার বাড়িতেই থাকেন।দু দুটো ধনীপুত্রের মা হয়েও পুত্রবধূর যত্ন তার কপালে জোটে না।

মেয়ে সুমনা বলে,মা দুঃখ কোরো না।ওদের কর্তব্যের কথা মনে নেই।ওরাও ওদের ছেলেমেয়ের কাছে ভাল ব্যবহার পাবে তা? সুমনার মা কুসুম বলেন,ভগবান ওরা যেন সুখে থাকে।সুমনের বর গৌতম খুব ভাল ছেলে।চাকরি ছেড়েও নিজের মা ও শ্বাশুড়ির মধ্যে কোন প্রভেদ দেখে না।গৌতমের বন্ধু নুর আলি,মাধব,অংশুমান সকলেই তাকে পুব পছন্দ করে।সরল মনের মানুষকে সকলেই পছন্দ করে। কুসুম ভাবে সন্তু,নন্তু তো কষ্টের মধ্যে মানুষ হয়েছে।তবু মা কে তারা দেখে না কেন? উত্তর খুঁজে পায় না কুসুম।সুনীল বড় হয়েছে বন জঙ্গলের আদর পেয়ে ।ছোটো থেকেই মায়ের সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে থেকেছে। বাবা থাকলেও তার সঙ্গে ভাব ছিলো না সুনীলের। তাকে এড়িয়ে চলতো সুনীল।তার কারণ বাবা খুন রাগী লোক। সবসময় মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে। মাকে গালগালি দেয়। মনের মধ্যে সুনীলের বাবার প্রতি শ্রদ্ধা নেই শৈশব থেকেই। সে তার মায়ের কাছে থাকে। পাড়ার দাদুর কাছে পড়াশোনার শেষে গল্প শুনতে যায়। মা বিভিন্ন সময়ে রকমারি পুজো করেন। ব্রত পালন করেন। নিজেকে এইসবের মধ্যে ব্যস্ত রাখেন তিনি। মা পৌষ মাসের ব্রত পালন করেন। মা ব্রতকথা শোনানোর জন্য সুনীলকে পাড়ার মাসিকে ডেকে আনতে বললেন। মাসি এলো, কাকিমা এলো। মাসি বলেন, পৌষ মাসে যে মহিলারা এই ব্রত পালন করেন, কথিত আছে, তাঁর পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের কল্যাণ সাধিত হয়।মা বলেন, ঠিক বলেছেন আপনি।কাকিমা বললেন, এবার আপনি বলুন। আমরা শুনি। মা বলতে শুরু করলেন, নতুন ধানের তুঁষ আর গোবর দিয়ে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে বড় বড় চারটে নাড়ু পাকানো হয়। সর্ষে ফুল আর নাড়ু ধরে পুজো করা হয়।১লা পৌষ থেকে প্রতিদিন ছোটো নাড়ু চারটে করে সংক্রান্তির আগের দিন অবধি পূজা করা হয়।সুনীল প্রশ্ন করে মা ক্ষীরের নাড়ু খাবো আমি। মা বলেন, নিশ্চয় খাবি। তবে পাশের বাড়ির কাকিমা, মাসিমাকে ব্রতকথা শোনাই দাঁড়া। কাকিমা বললো,আমাকে ভালো করে শিখিয়ে দাও দিদি। আমার খুব ভালো লাগে এসব। পাশের বাড়ির কাকিমা এ সব একদম কিছু জানে না। মা তাকে শিখিয়ে দেয় নিয়মাবলী। মা বলেন, শোনো, নিয়ম তো অনেক

আছে। তবে যতটা পারা যায় সংক্ষেপে বলি।   মকর সংক্রান্তির দিন ছ' কুড়ি ছ'গন্ডা অর্থাৎ ১৪৪টি ক্ষীরের নাড়ু আর পরমান্ন তৈরি করে খেতে হয়। খাবার সময় সেঁজুতির দূর্বা ও তুঁষ তুঁষলীর নাড়ুগুলি একটি মালসা বা হাঁড়ির ভিতর রেখে তাতে আগুন দিতে হয়। পিছন দিকে রেখে খাওয়া শেষ হলে ভাসান মন্ত্র পড়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে আঁচিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়।এইভাবে চার বছর পালন করার পর ব্রত উদ্ যাপন করা হয়। সরষে ফুল ওমূলা ফুল দিয়ে মন্ত্র বলা হয়

তুঁষ তুঁষুলী কাঁধে ছাতি
বাপ মার ধন যাচাযাচি
স্বামীর ধন নিজ পতি
পুত্রের ধনে বাঁধা হাতি
ঘর কোরবো নগরে
মরবো গিয়ে সাগরে
জন্মাব উত্তম কুলীন
বামুনের ঘরে।

পৌষ মাসভর পূজা করতে হয়। সংক্রান্তির দিন যে চারটি নাড়ু বেশি থাকবে তা নিয়ে ফুল দূর্বাসহ পুজো করে লক্ষীর হাঁড়িতে তুলে রাখা হয়। ক্ষীরের নাড়ু খেতে খেতে মন্ত্র পড়া হয়
তুঁষ তুঁষুল সুখে ভাসালি আখা জ্বলন্তি পাখা চলন্তি
চন্দন কাঠে রন্ধন করে খাবার আগে তুঁষ পোড়ে
খরকের আগে ভোজন করে
প্রাণ সুখেতে নতুন বসতে
কাল কাটাব আমি জন্ম এয়োতে।

চার বছর পর ব্রত উদ্ যাপন করতে হয়।কাকিমা বলে, কি হবে এসব করে? মা হাসতে হাসতে বলেন, বিশ্বাস থেকেই ভক্তি। পৌষমাসের শুক্লাপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত পালন করা হয়। এর ফলে পুত্র কন্যার অকাল মৃত্যু রোধ হয় বলে বিশ্বাস নারীমহলে। শোনো গল্প তাহলে,নন্দী গ্রামে এক নারীর বৌমা ও

নন্দী গ্রামে এক নারীর বৌমা ও ছেলে ছিলো। তার নাতিপুতি ছিলো না। বৌমা খুব পেটুক। সে ঠাকুরের নৈবেদ্যের থালা থেকে কলাটা,সন্দেশটা নিয়ে খেয়ে নিত। ফলে তার কোনো ছেলেপিলে হতো না। মহিলা এক সাধুর পরামর্শে পাটাই ষষ্ঠীর ব্রত পালন করতে লাগলেন।বাড়ির উঠোনে পুকুর কেটে বেণা ডালের পাটাই পুঁতে নৈবেদ্যের রেকাবি সাজিয়ে পুরুতকে দিয়ে পুজো করালেন। বউএর নৈবেদ্য দেখে জিভে জল এলো। মহিলার শঙ্খধ্বনিতে তার চেতনা ফিরলো। মহিলা বৌমাকে বললেন, পাটাই দেবীর কাছে ক্ষমা চেয়ে বর প্রার্থনা করো। বৌমা তাই করলেন। এক বছর পরে তিনি গর্ভবতী হলেন। সংসারে ঘর আলো করে নাতনি এলো। মহিলা সুখে সংসার করতে লাগলেন। চলিত আছে যে এই ব্রত করলে মৃতবৎসা প্রসূতির সন্তান হয় ও জীবিত থাকে। কুমারী, সধবা,পুত্রবতী ও বিধবা সকলেই এই ব্রত পালন করতে পারেন।অষ্টচাল,অষ্টদূর্বা কলসপাত্রে ধুয়ে, শোন সবে ইতুর কথা ভক্তিযুক্ত হয়ে।

এই ব্রত কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে আরম্ভ করতে হয় এবং অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন পুজো শেষ করে সেইদিন ইতুরসাধ দিয়ে সকলে প্রসাদ পায়।সন্দে, মন্ডা,মিঠাই ও সাধ্যমত ফলমূল দিয়ে নৈবেদ্যের রেকাবি সাজাতে হয়। পুজো হওয়ার পরে সকলে প্রসাদ পায়। মা গোঠষষ্ঠী ব্রত ও অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে করতে হয়। ঘটে বটের ডাল,দধি,তৈল,হলুদবাটা, ফল,ফুল সবই দিতে হয়।পিঠুলির গোঠ গঠন করে দিয়ে বাঁশের পাতায় বারো মাসে তেরো ষাট দিতে হয়। রালদুর্গা ব্রত যে নারী করেন তার সকল দুঃখের শেষ হয়ে সুখের উদয় হয়।কুলুই মঙ্গলবার ব্রত এই মাসে পালন করতে হয়। কুলের ডাল পুঁতে ঘটস্থাপন করতে হয়। একটি বড় কুলোতে পিঁটুলির আলপনায় ১৭টি ডিঙি অঙ্কিত করে ১৭টি কুল, ১৭টি কুলপাতা, জোড়া মূলা,জোড়া কড়াইশুঁটি , ১৭ভাগ নতুন চিঁড়ে,নতুন খইয়ের মুড়কি দিয়ে কুলোয় সাজাতে হয়। আতপ চালের নৈবেদ্য সাজাতে হয় রেকাবিতে । এছাড়া ক্ষেত্রব্রত, সেঁজুতিব্রত, নাটাইচন্ডী ব্রত, মুলোষষ্ঠীর ব্রত প্রভৃতি ব্রত আছে যেগুলি এই মাসেই পালন করতে হয়।

১১

এইসব দেখেই কালিদাস বড় হয়েছেন।নাটাইচন্ডীর ব্রতে রবিবারে মায়ের কাছে বর চাওয়া হয়। ধন সম্পত্তি হারায় না কোনোদিন এই ব্রত পালন করলে। নাটাই চন্ডীর কাছে প্রার্থনা করতে হয়,মা নাটাই চন্ডী, আমরা যেনো হারানো ধন খুঁজে পাই। নানা উপাচারে পূজা করা হয় নাটাই চন্ডীর। কাকিমা মায়ের কাছে ব্রতকথা শোনার পরে প্রণাম করেন। মাকেও একটা প্রণাম ঠুকে দেন। মা বলেন, করো কি বোন। কাকিমা বলেন, আপনার কাছে অনেক কিছু শিখলাম। মা বলেন, তোমাকে একদিন জয় মঙ্গলবারের ব্রতকথাও শোনাবো। দেখবে ভালো লাগবে। সুনীল দেখলো মা লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন। মাকে এখন সারদা মায়ের মত লাগছে।

এবার বাবা অফিসে যাবে। বন্ধুর বাড়ি যান সকালে উঠে। গল্পগুজব করে দশটায় বেড়িয়ে পরেন কাজে। বাবা বললো,সুনী, তোর মাকে বল,পিন্ডি বেড়ে দিতে। এখনি যাবো। সতীগিরি দেখাতে মানা কর। আমি সব জানি। শালা জালি মালটা আমার কপালেই জুটলো। মা সুনীলকে পাঠিয়ে দেন গল্পদাদুর কাছে। সুনীল ভাবে, বাবা কেন মা কে জ্বালায়।মা তো খুব ভালো। ঠাকুর বাবাটা এরকম কেন? আমার বাবার উপর কি ভূত বা পেত্নী ভর করেছে। দাদু এরকম একটা গল্প বলেছিলেন। যাইহোক, মা বাইরে বাবার কথা বলতে বারণ করেছেন।কাউকে বলা যাবে না। এমনকি দাদুকেও না। সুনীল জানে, মা মাঠের বাড়ির ফাঁকা জায়গায় গাছ লাগাতেন অবসর সময়ে। মায়ের সারাদিন শুধু কাজ আর কাজ। মায়ের বাবার অফিসের মত ছুটি নেই। বিশ্রাম নেই। বৈকালিক ভ্রমণ নেই। বাবা অফিস থেকে এসেই জলখাবার খান। মা রান্নাঘরে। তারপর রাতের রান্নার ফাঁকে আমাকে পড়ানো। সুনীল বাবার পিঠে চোখ দেখতে পায় না। মা ছাদে উঠলে ঘন একরাশ আলো মায়ের চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। ছাদ থেকে প্রতিবেশির সঙ্গে কথা বলে। আজকে সুনীলের বাবা একটা চিঠি এনেছে। বিয়ের চিঠি। কলকাতার কাকুর মেয়ের বিয়ে। ঠিক হলো সুনীল আরবাবা যাবে। মা যাবে না। কারণ বাড়ি ফাঁকা থাকলে চোর আসে। সব কিছু চুরি করে। সুনীল ভাবে,

চোর মাকে চুরি করে নিয়ে যাবে না তো? আবার ভাবে বাবার সঙ্গে গেলে কলকাতা ঘোরা হবে। পড়া ফাঁকি দিয়ে মোবাইল ঘাঁটা হবে। তবু তার মায়ের জন্য মনখারাপ করে। কিন্তু একথা বলা যাবে না কাউকে। এখনও যাবার দিন ঠিক হয় নি। সুনীল পাড়ার দাদুর কাছে গল্প শোনে। দাদু বলেন, বেশি কৌতূহল ভালো নয়। তেনাদের নিয়ে আলোচনা করলে হয়তো তাদের ভালো লাগে। তাই তারা দল ভারি করার জন্য দলে টেনে নেয়। অপদেবতাদের বিচরণভূমি কাঁদরের ধারে,পোড়ো বাড়ির ভিতরেকিংবা জনকোলাহলহীন যে কোনো জায়গা হতে পারে।।অশুভ শক্তি এক জায়গায় জড় হয়ে নাচ করে ভূত চতুর্দশীর রাতজুড়ে। এইসব কথা আবার আমার দাদুর মুখে শোনা।তিনি বলেন,অপমৃত্যু হওয়া আত্মাগুলো সহজে মুক্তি পায় না। সেইসব আত্মা ঘুরে বেড়ায় অতৃপ্ত মনে। ,বামুন পাড়ার বিমানদাদু গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। তিনি রাজা উজিরের মত থাকতেন। বিরাট আলখাল্লার আড়ালে তার দারিদ্র্য ঢাকা থাকতো।মন তার তৃপ্ত ছিলো না। প্রতিরাতে নেশা করতেন।আরও অনেক দোষ ছিলো।কাঁদরের ধারে একটা বেলগাছ ছিলো। দাদু বলতেন, এই বেলগাছের পাশে একটা শিমূলগাছ। বহু বছর ধরে আছে। সেখানে একদিন পথকুড়ো ফুল কুড়োতে কুড়োতে যাচ্ছিলো।পথকুড়ো দেখলো,সেই শিমূল ফুল তার হাতে এসে হয়ে গেলো শিশুর মাথা। ভয় পেয়ে ছুটে এসে পড়লো ঘাটে। সেই ঘাট থেকেই একেবারে গঙ্গার ঘাটে।পথকুড়ো মরার পরে আর কেউ ওদিকে তাকাতো না। প্রয়োজন হলেও ও পথে পা বাড়াতো না। সবাই বলতো,ওখানে অপদেবতাদের বাস। ওখানে গিয়ে ওস্তাদি করলেই সর্বনাশ হবে। একদিন সকালে ওই শিমূল গাছে বিমান পাঠক গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছিলো রাজার বেশে।দাদু কাঁদরের এপাড় থেকে একরাতে দেখেছিলেন, যাত্রার আসরের মত জাঁকজমক। বিমান তার পোশাক পড়ে রাজার মেজাজে ঘুরতো। লাফিয়ে বেলগাছে উঠতো। দাদুর সঙ্গে আরও দুজন সাহসী লোক ছিলো। তারা দেখলো,জীবনে বিমান শখ আহ্লাদ পূরণ করতে না পারলেও অপদেবতাদের আসরে তার কোনো শখ অপূর্ণ থাকতো না।ভূতের ভয় লাগে নি দাদুর।পালাগান শোনার

মত অপদেবতাদের গান শুনেছেন। বললে,অনেকে বিশ্বাস করে না।দাদু প্রায় প্রতি রাতে একবার করে কাঁদরের পাড়ে ঘুর ঘুর করতেন। এই দাদু পাড়ার সকলের প্রিয় ব্যাক্তি। গ্রামের লোকে বলতো,এত সাহস ভালো লয় গো। রাত বিরেতে কেনে ওখানে মরতে যাও। কোনোদিন দেখবা তোমার দশাও পথকুড়োর মত হবে।

কবি বলতেন বন্ধুদের,দাদু শুনতো না। সাত কুলে তার কেউ নাই। তাই ভয়ও নাই। এর বাড়ি ওর বাড়ি খেয়ে দিন গুজরান হত দাদুর। কেউ বিপদে পড়লে জান দিয়ে তার সেবা করত।তাই তো গ্রামের সকলে তাকে মাথায় করে রাখতো। দাদু প্রায় চেঁচিয়ে একটা কথা বলতেন,পালাবার পথ নাই, যম আছে পিছে। মরণকে তার ভয় ছিলো না। তিনি বলতেন, বেঁচে থাকার চেয়ে মরণের পরে বেশি সুখ। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতেন না বেশি কথা। তিনি বলতেন,অপদেবতাদের অনুভূতি অন্তরে হয়। প্রকাশ করা যায় না।তিনি তার ছাত্রজীবনের কথা আমাদের বলেছিলেন।একবার তার বন্ধু রমেন আর কয়েকজন রাতে কাঁদরের ধারে গেছিলো।সে ডুব সাঁতারে ওপাড়ে চলে গেলো। দাদু ছিলো এপাড়ে।তারপর অপদেবতা তাকে তুলে নিয়ে গেলো বোধহয়।বাড়ি থেকে পুলিশে খবর দিলো। সবাই আমরা উৎকন্ঠা নিয়ে বসে আছি। কখন আসবে রমেন। ঠিক সকাল দশটায় পুলিশের গাড়ি চলে এলো গ্রামে। আমাকে সবাই অবাক হয়ে দেখলো পুলিশের গাড়ি থেকে নামছি আমি।এর মধ্যে নরেনও হন্ত দন্ত হয়ে আমার কাছে এসে বললো,যাক প্রাণে বেঁচে আছি । মেজবাবু তার বাবাকে বললেন,এটাই আপনার ছেলে নরেন তো?

---- হ্যাঁ স্যার।

----আমাদের থানার আশেপাশে ঘুরতে দেখে ওকে নিয়ে এলাম। আমাদের স্থির বিশ্বাস ছিলো এটা নরেন । ওর মুখে সব কিছু শুনলে বুঝতে পারবেন ওর সমস্যা। যাই হোক, আমরা আসি।

পুলিশের গাড়ি চলে গেলো। প্রায় দুঘন্টা হলো দাদু ঘুমিয়ে আছে। দুপুর একটায় ওর ঘুম ভাঙ্গলো।নরেন জিজ্ঞাসা করলো,আমার কি হয়েছিলো বল তো দাদু।

দাদু বলতে শুরু করলো নরেনের অলৌকিক কাহিনী।নরেনের জ্ঞান ছিলো না। দাদু বললো,আমার এক বন্ধুর তোর মত অবস্থা হয়েছিলো। বন্ধু বললো,আমরা সবাই যখন কাঙরা কাঁদর পার হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি তখনই আমাকে খনা গলায় নিশি ভূতটা বললো,কি রে তোর বাড়ি গিয়ে ডাকলাম। সাড়া পেলুম না। তাই গন্ধ পেয়ে এখানে এলাম। চল আমার সঙ্গে তোকে হাওড়া ব্রীজ দেখিয়ে আনি। আমি বললাম,এই রাতে বন্ধুদের ছেড়ে আমি হাওড়া যাবো না। নিশিটা বললো,যা বলবো শুনবি।তা না হলে উঁচু থেকে ফেলে দেবো।আমি আর ভয়ে কথা বলিনি। নিশি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেলো হাওড়া ব্রীজে। আমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। তারপর যখন নিশিটা আমাকে নিচে নামালো তখন জ্ঞান এলো। নিশি বললো,কেমন লাগছে। কি খাবি বল। তারপর আবার বললো,গঙ্গার জলে সাঁতা কাটবি নাকি?আমি বললাম,আমি সাঁতার জানি না।নিশি বললো,আমি থাকলে ওসব কিছু দরকার হয় না। এই বলে আমাকে ওপর থেকে গঙ্গার বুকে ঝুপ করে ফেলে দিলো।তারপর জামাটা মুঠো করে পুতুলের মত তুলে নিয়ে ওপরে এলো।আমি ভাবলাম, আমার জীবনের শেষ দিন আজকে। নিশি মনের কথা জানতে পেরে বললো,আমরা প্রাণে মারি না কাউকে। শুধু ঘুরে বেড়াই।কাজ করি। তারপর দিনের আলো ফুটতেই নিশিটা পালিয়ে গেলো।তারপর নরেনকে দাদু বললো, তোর দশাও এইরকম হয়েছে।সব ভূত খারাপ হয় না।

১২

ছোটবেলার কবির স্কুলে রতন ক্লাসমেট ছিল।হেড মাষ্টারের পরেই সেকেণ্ড মাষ্টারের নাম!তাই পাঁচ গাঁয়ের লোকজন তাকে

সেকেন মাষ্টার বলে!রিটায়ার হওয়ার পরেও সকলের ভালোবাসায় স্কুলে পড়াতে আসতেন!সব সময় তার হাসিমুখে কাজ মানুষের বিপদে আপদে কাজে দিত!পৃথিবীতে কিছু মানুষ মানুষের কাজ করতেই জন্মগ্রহণ করেন!তার ভালবাসার পরশ পাথরের ছোঁয়া পেয়ে মন্দ মনের মানুষও ভাল হয়ে যেত!

কালিদাস দেখেছে বৃষ্টিতে ভিজে রোদে পুড়ে মানুষটা সকলের সেবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছেন!একবার মাঝি পাড়ার দুখিকে সাপে কামড়েছিলো ,সেকেন মাষ্টার গিয়ে দেখেন,ওঝা এসেই ঝাড়ফুঁক শুরু করেছেন!ওঝাকে বললেন মাষ্টার,ওকে ছেড়ে দাও ,আমি হাসপাতালে নিয়ে যাব!সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে চলে গেলেন মহুকুমা হাসপাতালে !দুখি ফিরে এলে ওর বাবা, মা মাষ্টারকে প্রণাম করে দুটি কুমড়ো দিয়েছিলেন !তারা বললেন ,এটা আমাদের ভালবাসার উপহার !লিতেই হবে !তিনি নিয়ে পরে ডোম পাড়ার খেনি বুড়িকে দান করে দিলেন !

সুখ দুখে তাকে ছাড়া কারও চলত না! গাঁয়ের সেকেণ্ড মাষ্টার সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন অজান্তে! একবার বন্যার সময় চার রাত স্কুলের ছাদে সকল দুর্গতদের সঙ্গে থেকে তাদের সাহায্য করেছিলেন! নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের সেবা করাই ছিলো তার ধর্ম!তিনি নামতা পড়াতেন,দুই একে দুই,বাড়ির পাশে ভুঁই !দুই দুকুনে চার,দেশ তোমার আমার,দুই তিনে ছয়,জাতি দাঙ্গা নয়!এই রকম বিভিন্ন রকমের শিক্ষামূলক ছড়া শূনিয়ে শিশুদের জীবনের ভিত শক্ত করে দিতেন!তাঁর প্রত্যেক কাজেই ছিলো জীবনের ছোঁয়া !সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পড়ে সাইকেল চালিয়ে তিনি স্কুলে আসতেন সাধকের মনে ! স্কুল ছিলো তার সাধনার স্থান !ছাত্র ছাত্রীরা ছিলো তার ভগবান,আল্লা বা যিশু !! তিনি যখন স্কুলে নিয়মিত শিক্ষক ছিলেন তখন সকল ছাত্রদের নিজের খরচায় টিফিন খাওয়াতৈন !সিদু কাকা বলতেন ,তখন তো আর মিড দে মিল ছিলো না !এই সেকেন মাষ্টার নিজের খরচে সকলকে খাওয়াতেন ,বুঝলে বাবাসকল !তারপর তার স্ত্রী গত হলেন ! তবুও স্কুল নিয়মিত আসতেন তিনি !আমাদের অনুরোধে রিটায়ার হওয়ার পরেও তিনি স্কুলে আসেন ! ইনি হচ্ছেন আদর্শ শিক্ষক গো !আর কোথাও এমনটি দেখলুম না ! গ্রামের

ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে শোনে সিদু কাকার কথা !প্রসন্ন মনে তাদের সেবা করতেন অবিরাম!গ্রামের মানুষজন তাকে মান্য করতেন গুরুদেবের মত!কুকুর,বিড়াল,ছাগল কোনো প্রাণী তার করুণা থেকে বঞ্চিত হত না! এক ভালোবাসার মন্ত্রে সকলকে গেঁথে দিত তার হৃদয়!সিদু কাকা একদিন বললেন,আমার একটা আশ্রম আছে!সেখানে অনেক অনাথ শিশু থাকে !মাষ্টার তুমি কিছু টাকা চাঁদা তুলে দিও !

সেকেন্ড মাষ্টারকে সকলে সেকেন মাষ্টার বলেই ডাকতেন।তার কথা কেউ ফেলতে পারেন না !তার কথায় অনেক চাঁদা উঠলো আর নিজেও রিটায়ার্ডের টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা দান করলেন !আশ্রমের শিশুরা এখন ভালভাবে খায় ,পড়ে!সেকেন মাষ্টারের ছেলেপিলে নেই !নিঃসন্তান!তিনি বলেন,ছাত্র ছাত্রীরাই আমার সন্তান !এইভাবেই হেসে খেলে জীবন কেটে গেলেই হলো ! দাদু এবার এক কাপ চা খেলেন। তারপর আবার শুরু করলেন কথা। একদিন সেকেন মাষ্টার স্কুলে এলেন !শুনলেন রাষ্ট্রপতি আসবেন নিজের গ্রামে! কেতুগ্রামের পাশেই বাড়ি !বিরাট তোড়জোড় ! পুলিশের ভিড়!তার বাড়িতে পুলিশের বড় বড় ইনস্পেক্টরের ভিড়!সেকেন মাষ্টার ছেলেদের বলেন ,মানুষ হওয়া জীবনের লক্ষ্য হোক তোমাদের !মানুষ হয়ে মানুষকে ভালোবাসো !তবেই ধন্য হবে তোমাদের জীবন !

সেকেন মাষ্টার তার জীবনের ছোটোবেলার কথা মনে করছেন ! তার মনে পড়ে একবার স্কুলে যাওয়ার পথে কাংরা গাবার জলে তার বন্ধু অসীম জলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলো!অসীম সাঁতার জানতো না !এক সাদুবাবা বলছেন ,মর শালা !সাঁতার জানিস না তো জলে নামার দরকার কি ?সেকেন মাষ্টার দেরী না করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অসীমের চুল টেনে তুলেছিলো ডাঙায় !সাদু বলেছিলো ,ভালো কাজ করলে বাবা !ছেলেটা তা না হলে মরে যেতো !মাষ্টার বললো ,আপনি নামলেন না জলে ! সাদু বললো ,জলে আমার খুব ভয় !আমিও সাঁতার শিখি নাই ! তাই তো বুক বুক করছিলাম !অসীম এখন অই স্কুলের হেডমাষ্টার ! হেডমাষ্টার হলেও সেকেন মাষ্টারের কথা কখনও ফেলেন না হেডমাষ্টার ! দুদিন পরে রাষ্ট্রপতির গাড়ি গাঁয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো !

রাষ্ট্রপতি এই স্কুলেই ছোটোবেলায় পড়েছেন! তাই স্কুলে একবার এলেন ! ছেলে মেয়েরা ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিলো আনন্দে ! গ্রামের লোকজন ভিড় করে এলেন !সেকেন মাষ্টার নীরবে নির্জন ঘরে বসে আছেন ! রাষ্ট্রপতি স্কুলে ঢুকেই সেকেন মাষ্টারের খোঁজ করলেন! রাষ্ট্রপতি মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন ,আপনার জন্যই এখানে এলাম !কেমন আছেন স্যার ! সেকেন মাষ্টার বললেন, ভালো!তুমি আরও ভালো মানুষ হও বাবা ! পাড়ার সবাই দেখে অবাক ! সেকেন মাষ্টারকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন রাষ্ট্রপতি ! সিদু কাকা বললেন ,অনেকেই রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পায় ! কিন্তু প্রণাম কজনে পায় গো?দাদুকে আমরা বললা, তাহলে রতনই রাষ্ট্রপতি হয়েছিলো নাকি দাদু? দাদু বলেন, বাকিটুকু বুঝে নাও বাবা। কাকার ছেলে অবাক হয়ে শুনলো। তারপর বলে বসলো, আমিও রাষ্ট্রপতি হবো। সুনীল ছিল কালিদাসের পাশের বাড়ির বন্ধু। সে বললো, আমি ওইরকম শিক্ষক হবো। তারপর লাফাতে লাফাতে তার মায়ের কাছে চলে গেলো। এবার সুনীল একা হয়ে পড়লো। সে ছাদে চলে গেলো। দেখলো, মায়ের মুখের মত উজ্জ্বল চাঁদটা তাকে ডাকছে। সে ভাবে, হয়ত মা তাকে ডাকছে। আর ভালো লাগছে না। দিদির বিয়ের পরের দিন চলে যাবে। বাবা বলছিলে, কন্যাযাত্রী যাবি না। সুনীল যাবে না বলে দিয়েছে।

তারপর রাত হলে সকলে বিয়ে বাড়িতে ফিরে এলো সবাই। খাবার সময় খেলো।তারপর সুনীল ঘুরে বেড়ায় বাড়িময় । মায়ের মত মুখ খোঁজে।কাকিমার মেয়ে এসে বলে,এই সুনীল,এদিকে আয়।আমার কাছে বোস। কালকে আমার বিয়ে হয়ে যাবে। একটু কথা বলি তোর সঙ্গে। তোর কোন ক্লাস হোলো রে? আমি ভুলে গেছি। সুনীল বলে, এবার ক্লাস এইট হবে। তাহলে তুই এত বোকা হাবার মত চুপ করে থাকিস কেন? আচ্ছা বলো তো দিদি, মানুষের তিন চোখ পিছনে হয়। দিদি হেসে ওঠে। বলে,তুই এত বোকা কেন? এইটে পড়িস অথচ কি বোকা তুই। পিঠে কারও তিনচোখ হয় না। আর কাউকে জিজ্ঞেসও করবি না।

সুনীল কি করে বোঝায়,বাবার মুখ থেকে শোনা কথা কি করে মিথ্যা হয়। সে কিছু না বলে চুপ করে থাকে। দিদি বলে, তুই আর ভাই মিলেমিশে থাকবি। তোরা দুইভাই আমার শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে যাবি।

সুনীল বলে, যাবো। সুনীল দেখে দিদির চোখে জল। দিদিকে ঠিক এখন মায়ের মত লাগছে। মায়ের চোখের জলও ঠিক এইরকম। সব মায়ের চোখের জল কি এইরকম হয়। হতেও পারে। মায়ের জাত তো। একবার সুনীল গ্রামে বন্ধুর বাড়ি গেছিলো। সেখানেও সে তার মায়ের চোখে এইরকম জল টলটল করতে দেখেছিলো। চোখের জলের তো রঙ হয় না। তবু সুনীল একটা মিল খুঁজে পায়। আর কেউ পায় কি? সুনীল জানে না। আজ বিয়ে। বাড়ি ভর্তি লোকজন। কে কোথায় শোবে সব ব্যবস্থা হচ্ছে। পাড়ার প্রতিবেশীদের ঘর নেওয়া হয়েছে। কাছাকাছি সব বাড়ি। বেশ ভালো লাগছে সুনীলের। বাবাকে বেশি দেখতে পাচ্ছে না সে। হয়ত কাজে ব্যস্ত আছে।

সুনীলও মোবাইল নিয়ে গেম খেলে মাঝে মাঝে। চিড়িয়াখানার ছবিগুলো দেখে। কাকার ছেলে সন্তুকে দেখায়। সন্তুর আবার অনেক বন্ধু। মেগাসিটির ছেলে। বেশিক্ষণ এক জায়গার থাকে না। সে স্মার্ট। কথাবার্তা সুন্দর। অনেক বন্ধু। ছেলে মেয়েরা তাকে ডেকে নিয়ে যায়। কিন্তু সুনীল একা একা থাকতেই ভালোবাসে।

বেশি মাথা তার পছন্দ নয়। ভিড় এড়িয়ে চলাই তার মজ্জাগত অভ্যাস। একজন বললো,কি রে হাবাগোবার মত বসে আছিস কেন? যা খেলা কর। আনন্দ কর। কিন্তু সুনীলের খেলতে এখন ভালো লাগছে না। খেতেও ভালো লাগছে না। মা হয়ত খেতেও পাচ্ছে না আমার কথা মনে করে। মায়ের তো আর কেউ নেই, আমি ছাড়া। আমি মায়ের কাছে যাবো। সুনীল চঞ্চল হয়ে উঠলো। রাত হয়ে গেলো। বর যাত্রীর বাস চলে গেলো। তবু প্যান্ডেল ভরতি লোকজন। কিন্তু সুনিল বাবাকে দেখতে পায় না। বাবা কোথায় গেলো। এবার তো শুয়ে ঘুমোতে হবে। সকালে উঠেই বাড়ি যেতে হবে। আর ভালো লাগছে না মাকে ছেড়ে। মাকে ছেড়ে সুনীলের এই প্রথম থাকা। গুটি গুটি পায়ে সুনীল বাবাকে খুঁজতে খুঁজতে গেলো রায়বাড়ি। এই বাড়িতে তাদের

শোয়া খাওয়ার ব্যবস্থা। ঘর খোলা।অন্ধকার ঘর। তবু পাশের বাড়ির জানালা গলে এক চিলতে আলো পড়েছে ঘরের মেঝেতে। একটা আলোছায়ার মত ঘরের মায়াময় অবস্থা। সুনীল দেখলো দুটো মানুষ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। পিঠগুলো আড়াআড়ি ভাবে আছে। ঠোঁটে ঠোঁট একবার লাগছে আবার খুলে যাচ্ছে। বাবাকে চিনতে পারা যাচ্ছে। আর ওটা কে? মাছ খাচ্ছে মনে হচ্ছে। এ নিশ্চয়ই মেছো পেত্নি। দুজনের কাপড় চোপড় এলোমেলো। বাবাকে ধরেছে, যাদু করেছে পেত্নীটা। পেত্নীটার বড় বড় মাথার চুল।দুধগুলো দুলছে বাতাবি লেবুর মত। সুনীল বাতাবি লেবু দেখেছে বাবুদের গোয়াল বাড়িতে। দুজনের ঠোঁটে একটা করে, মোট দুটো তেচোখা মাছ। লালায় সাঁতার কাটছে। একবার এদিকে যাচ্ছে আর একবার ওদিকে। চুমু খাওয়ার সময় চোখ বন্ধ হয় কেন? সুনীল জানে না। ওদের দুজনের পিঠ দেখা যাচ্ছে না। তাহলে দেখা যেতো দুজনেরই কি পিঠে তিনটে চোখ?

১৩

সুনীল দেখছে মেছো পেত্নীর গালের কষ বেয়ে বাবার দাবনার কাছে তিনচোখের মাঝখানে রক্ত পড়ছে টপ টপ করে। মোবাইল তার হাতে আছে। কিন্তু ছবি তুললেই ফ্ল্যাশ হবে। জেগে যাবে তিনচোখ। আর ভস্ম হয়ে যেতে পারে তার চোখ মুখ মন। তার থেকে এই মেছোপেত্নী তাড়াবার মন্ত্রটা বলি মনে মনে। মায়ের কাছে শোনা মন্ত্র। 'খটাং খটাং খটাং, সাত ভুবনের জাহাজ খটাং। আসতে কাটে, যেতে কাটে, ছেদ কাটে, ভেদ কাটে। আমার বাবাকে যে করে হান , তার বুকে মারি শ্রীরামচন্দ্রের জলপড়া বাণ।' সুনীল ভাবে, মাকে বাড়ি গিয়ে এই মেছো পেত্নী আর তিনচোখের কথা বলতেই হবে.। তারপর সুনীল বাড়িতে এসে মাকে কথাটা বলতে পারে নি।বাবা মায়ের গায়ে হাত তুলত। সুনীলের মা একদিন সহ্য করতে না পেরে বাবাকে ছেড়ে চলে আসে কলকাতায়।সেখানে বাড়ি বাড়ি রান্না করে সুনীল আর সুনীলের মা থাকত সুখে।সুনীল পড়াশোনাটা চালিয়ে যায়।

এখানে এসে সুনীলের মায়ের সঙ্গে পরিচয় হয় কুসুমের।কুসুমের মেয়ে সুমনার এই পাড়াতেই বাড়ি।সুনীলের মায়ের খুব ভালো সঙ্গী হল।

সুনীলের মা সুমনার বাড়িতে রান্না করতেন আর শুনতেন কুসুমের কথা।সুনীলের মা ভাবতেন,শুধু আমি নয়,জগতে কতশত মহিলা পুত্র এবং স্বামীর দ্বারা প্রতারিত তার হিসাব নেই।জীবন মাঝে মাঝে ক্যাকটাসের কত কন্টময় হয়ে ওঠে।জীবনে চলার মত কুসুমাস্তীর্ণ নয়, একথা কুসুম বলেন।সুনীলের মা দশবছর পার করার পরে সুনীল চাকরি পেল একটা বেসরকারি ফার্মে। মাইনে ভালোই পায়।সুনীল আর মাকে রান্না করতে দেয় না।

এই দশ বছরে কুসুম পরলোকে চলে গেলেন।ছেলেরা খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ করল মায়ের।সুনীলের মা হার্ট অ্যাটাকে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মারা গেলেন।সুনীলের বিয়ের জন্য সুমনা তার ছোড়দাকে বলল,সুনীল শিক্ষিত, সভ্য এবং চাকরি করে।তার মাইনে প্রায় মাসিক ষাটহাজার টাকা । নন্তুর আপত্তি থাকল না।ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল সুনীলের। সুনীল খবর পেল গ্রামে তার বাবা পরলোকে গত হয়েছেন পাঁচবছর হল।ভিটেমাটিতে একবার যাওয়ার জন্য সুনীল তার বউকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে গেল। সেখানে পাকা বাড়ি তৈরি করল।প্রথমে চাকরি করত কলকাতায়। কিন্তু সেই চাকরির থেকে জমানো টাকায় সুনীল গ্রামে এসে চাল,ডালের আড়ত করল।এতে দেখা গেল চাকরির থেকে আয় বেশি।পাঁচবছরের মধ্যে দুটি পুত্র জন্মালো সুনীলের। এবার সুনীল সপরিবারে গ্রামে বাস করতে লাগল,তার মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে। সুনীলের সঙ্গে পরিচয় হল মাধবদার। মাধব পাশের গ্রামে থাকতেন।অনেকদিন পরে তিনিও গ্রামে ফিরেছেন সাধুর বেশে।মাধবও গ্রামে থাকবেন আর মানুষের সেবা করবেন তার অভ্যাসমত। সন্তু,নন্তুর কাহিনী সুনীল শুনেছে মায়ের কাছে।নিজের পুত্রদের সুনীল তাই মানুষের মত মানুষ করে, গড়ে তুলতে চায়।কবি রবীন্দ্র-ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে কাব্যচর্চা শুরু করেন। ১৯৭৫ সালে টালিগঞ্জে 'সন্ধ্যার কুলায়' নামক নিজস্ব বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কড়ুই গ্রামের কবির বন্ধু সন্তু বলতেন, পূর্ব বর্ধমানের এই স্বনামধন্য কবিকে শ্রদ্ধা জানাই এই জেলার অধিবাসী হিসেবে। এই জেলা তথা সমগ্র বাংলার পক্ষ থেকে অসংখ্য কুর্ণিশ তাঁর প্রতিভাকে। তাঁর জন্মভিটা সংস্কার করা খুব প্রয়োজন বলে মনে করি।১৮৯৬ সালে দীনেশচন্দ্রের পুঁথি সংগ্রহ, পুঁথিপাঠ এর সময় তাঁর কর্মজীবনে এবং গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নতুন পর্বের সূচনা হয়। তিনি উপাচার্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহবানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। প্রথমে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ পরীক্ষার বাংলা বিষয়ের পরীক্ষক (১৯০৫), পরে রীডার পদে (১৯০৯) নিযুক্তি লাভ করেন। ১৯১০ সালে মনোনীত হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য। ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর History of Bengali Language and Literature গ্রন্থ। এ গ্রন্থের জন্য তিনি পাশ্চাত্যের গবেষক ও সাহিত্য-সমালোচকদের কাছ থেকে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ’ পেয়ে (১৯১৩) তিনি মৈমনসিংহ-গীতিকাসহ পূবর্ববঙ্গ-গীতিকা (চার খন্ড, ১৯২৩-১৯৩২) এবং এর ইংরেজি ভাষ্যে Eastern Bengal Ballads (চার খন্ড, ১৯২৩-১৯৩২) সংকলন ও সম্পাদনা করেন। বাংলাদেশের সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য বিলুপ্তি থেকে উদ্ধার এবং এ সাহিত্য বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এসব সাহিত্যকর্ম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে এবং তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়।১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘বাংলা ভাষা ও সাহিত্য’ নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হলে দীনেশচন্দ্র সেন এ বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। এ বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় পাঠ্যগ্রন্থও প্রণয়ন করেন। বারো বছর তিনি যোগ্যতার সঙ্গে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করে ১৯৩২ সালে অবসর নেন।কবির সমকালীন সৃজনশীল লেখক দীনেশচন্দ্র সেন সাহিত্য সমাবেশে পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাংলা সাহিত্য বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিহাসধর্মী গ্রন্থ প্রণয়ন, পৌরাণিক আখ্যান রচনা, লোকসাহিত্য

সম্পাদনা ও বাঙালির ইতিহাস প্রণয়নের পাশাপাশি তিনি রচনা করেন কবিতা, উপন্যাস ও গল্প। সব মিলে তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা ৬০। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় (দুই খন্ড, সম্পাদনা: ১৯১৪), The Vaisnava Literature of Medieval Bengal (১৯১৭), Chaitanya and his Companions (১৯১৭) The Folk Literature of Bengal (১৯২০), The Bengali Ramayana (১৯২০), Bengali Prose Style : ১৮০০-১৮৫৭ (১৯২১), সরল বাঙ্গালা সাহিত্য (১৯২২), ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য (১৯২২), Glimpses of Bengal Life (১৯২৫), বৃহৎ বঙ্গ (দুই খন্ড, ১৯৩৫), আশুতোষ-স্মৃতিকথা (১৯৩৬), বাংলার পুরনারী (১৯৩৯), প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান (১৯৪০)।বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ও ভালোবাসার ফল বৃহৎ বঙ্গ। এটি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য গ্রন্থটি দীনেশচন্দ্র সেনের আত্মজীবনী। বাংলা জীবনী সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর এ গ্রন্থের মূল্য স্বীকার্য। তিনি এ গ্রন্থে নিজের বেড়ে ওঠা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতসহ তাঁর সাহিত্যিক জীবনের কথা অত্যন্ত সরল ও মনোহর ভাষায় বিবৃত করেন। চিন্তা ও চেতনায় অনগ্রসর মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক অবদানকে দীনেশচন্দ্র সেন অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেন তাঁর প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান শীর্ষক গ্রন্থটিতে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের অবদান অনেক ক্ষেত্রে অগ্রবর্তীর, ভুলে যাওয়া উচিত নয় এ সত্য-এ হচ্ছে তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থটির প্রধান বক্তব্য।সাহিত্য ও গবেষণায় অবদানের জন্য দীনেশচন্দ্র সেন ১৯২১ সালে ভারত সরকার কর্তৃক ‘রায়বাহাদুর’ উপাধি পান। একই সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট ডিগ্রি প্রদান করে এবং ১৯৩১ সালে তিনি জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৪

তৎকালীন ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন কবির কবিতায় তার চিত্র ধরা পড়েছে। তাছাড়া আইন অমান্য আন্দোলন ১৯৩০ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হয়। এ আন্দোলনের পটভূমি হলো সাইমন কমিশন। ভারতের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং তা চূড়ান্তকরণের জন্য ১৯২৭ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সাইমন কমিশন গঠিত হয়। কেবল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের নিয়ে এ কমিশন গঠিত হওয়ার কারণে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনের সব ধরনের নেতা ও কর্মীরা এটিকে পুরোপুরি একটি শ্বেতাঙ্গ কমিশন বলে বর্জন করে। বাংলায় সাইমন কমিশনের বিরোধিতা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কমিশন গঠনের প্রতিবাদে এ প্রদেশের বিভিন্ন অংশে ১৯২৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালিত হয়। ওই বছর ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সাইমনের আগমন উপলক্ষে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। কলকাতার ৩২টি ওয়ার্ডে একই সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৮ সালের ১ মার্চ। এসব সভায় ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করার আন্দোলন পুনরায় শুরু করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।ভারতীয়গণ কর্তৃক সাইমন কমিশনের সুপারিশ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ১৯২৮ সালের মে মাসে মুম্বাই নগরীতে ড. এম.এ আনসারীর সভাপতিত্বে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতের জন্য একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। ভারতীয় মুসলমানদের একটি অংশ ব্যতীত ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরের জনগণ কর্তৃকনেহেরু রিপোর্ট গৃহীত হয়। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে ‘নেহরু রিপোর্ট’ পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। ভারতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (ডিসেম্বর ১৯২৮) ব্রিটিশ সরকারকে কার্যত এ মর্মে একটি চরমপত্র দেওয়া হয় যে, যদি ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেভারতকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দান করা না হয় তাহলে সারা দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে। অবশ্য ব্রিটিশ সরকার ১৯২৯ সালের মে মাসে ঘোষণা করে যে, শীঘ্রই

ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া হবে। এর কয়েক মাস পর ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড আরউইন ঘোষণা করেন যে, ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দান করা। তার এ বিবৃতির পর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, তেজ বাহাদুর শাপ্রু, পন্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং অ্যানি বেস্যান্ট-এর মতো ভারতীয় নেতৃবৃন্দ গভর্নর জেনারেলকে অধিকতর উদার ফরমুলা প্রণয়নের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ পন্থায় সমগ্র সাংবিধানিক সংকট নিরসনের আহবান জানান। তাঁরা কারাগারে আটক সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি দাবি করেন। তাছাড়া তাঁরা প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক আহবানের মাধ্যমে ভারতের সাংবিধানিক সমস্যাবলি আলোচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইতোমধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহেরুর মতো কংগ্রেসের তরুণ নেতৃবৃন্দ দাবি করেন যে, তাদের সংগ্রামের লক্ষ্য ডোমিনিয়নের মর্যাদা অর্জন নয় বরং ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ অধিবেশন কংগ্রেস কার্যকরী কমিটিকে সারা দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার কর্তৃত্ব প্রদান করে এবং এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ২৬ জানুয়ারি তারিখে সারা ভারতে ‘পূর্ণ স্বরাজ’ (পূর্ণ স্বাধীনতা) দিবস পালন করা হবে।আগস্ট মাস জাতীয় জীবনে শোকের মাস বলে বহু বছর ধরে সরকারিভাবে পালিত হচ্ছে। আজ থেকে ৪৭ বছর আগে—১৯৭৫ সালের আগস্ট ১৫ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার, শুধু তাঁর দুই কন্যা ছাড়া, যাঁদের একজন আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বঙ্গবন্ধুর বাড়ির প্রায় সবাইকে হত্যা করা হয়।হত্যা করা হয় যুবলীগ নেতা শেখ মনি ও তৎকালীন মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতকে পরিবারের আরও সদস্যসহ। হত্যার পেছনে জড়িত ছিল তৎকালীন সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক চাকরিরত ও চাকরিচ্যুত মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কিছু জওয়ান। যদিও এটাকে সামরিক অভ্যুত্থান হিসেবে বহু জায়গায় উল্লেখ করা হয় কিন্তু আমার চোখে এ ঘটনা ছিল

বিদ্রোহ। কারণ, ঘটনাটি ঘটানো হয়েছিল দৃশ্যত চেইন অব কমান্ড ভঙ্গ করে।এ হত্যার সঙ্গে বহু প্রশ্ন জড়িত ছিল, যার মীমাংসা এখনো হয়নি। তাই হয়তো তদন্ত কমিশনের কথা বলা হচ্ছে। ঘটনার দিন সকাল থেকে ঢাকা সেনানিবাসে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত প্রায় ঘটে যাওয়া ২২টি ছোট-বড় ক্যু বা বিদ্রোহ নিয়ে ১৯৯৬ সালে আমার লেখা বাংলাদেশ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১ বইয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।এর আগে আরেকটি বই লিখেছিলেন প্রয়াত সেনা কর্মকর্তা কর্নেল হামিদ (অব.)। তিনি ওই সময় ঢাকা সেনানিবাসে স্টেশন কমান্ডার ছিলেন। আমি তখন একজন তরুণ কর্মকর্তা হিসেবে যা দেখেছি, উপলব্ধি করে ওই সময়কার সেনাবাহিনী এবং ওই দিনকার ঘটনার বর্ণনা, যতটুকু স্মৃতিতে ছিল লিখেছি। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর তৎকালীন ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিলের (বীর বিক্রম) নির্দেশে সেখানে তোলা ছবির ফিল্ম জব্দ করতে ১৫ আগস্ট সকালে আমি ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে গিয়েছিলাম। সেই বাড়িতে গিয়ে যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা আমাকে এখনো তাড়া করে বেড়ায়। ওই সময় অনেকগুলো প্রশ্ন আমার মনে জেগেছিল এবং আমার বইয়ে তা তুলে ধরেছি। দীর্ঘদিন পর আমার সেই বইটিকে পরিবর্ধিত আকারে আবার নতুন নামে (রক্তঝরা দিনগুলি: ১৯৭৫-৮১, প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতায় পাল্টাপাল্টি অভ্যুত্থানের বিবরণ) প্রকাশ করতে যাচ্ছে প্রথমা প্রকাশন।ওই দুটি বই প্রকাশের পর অনেক বছর কেটে গেছে। আমার সব প্রশ্নের উত্তর তেমন পাওয়া না গেলেও কিছু কিছু পেয়েছি। এগুলো পেয়েছি, ওই সময়কার সেনাপ্রধান থেকে শুরু করে কিছু কর্মকর্তার লেখা বই পড়ে।তাঁদের মধ্যে মেজর জেনারেল (অব.) সফিউল্লাহ বীর উত্তম, ওই সময়কার সেনাপ্রধান, তখনকার ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার প্রয়াত কর্নেল (অব.) শাফায়াত জামিল বীর বিক্রম, ঢাকার ৪৬ ব্রিগেডের মেজর (অব.) হাফিজউদ্দিন বীর বিক্রম ও লে. কর্নেল (অব.) প্রয়াত আনোয়ারুল আলম শহীদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আনোয়ারুল আলম ওই সময় রক্ষীবাহিনীর পরিচালক পদে ঢাকায় অবস্থান করতেন। উল্লেখ্য, ওই সময় ঢাকার ৪৬ ব্রিগেডে

আমিও কর্মরত ছিলাম।

১৫

কালিদাস ছোটবেলা থেকেই বৈষ্ণব ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কাশিমবাজার রাজবাড়ির মহারাজা ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। মহারাজের অণুপ্রেরণায় ও উদ্যোগে রাজবাড়ীতে দোল উৎসব, রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে কীর্তন, যাত্রা, কবিগান, থিয়েটার প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত। কাশিমবাজারে থাকাকালীন কালিদাস কীর্তন ও কবিগানের প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়েন এবং ব্রজবুলি ভাষায় কবিতা রচনা করার জন্য সচেষ্ট হন। উলিপুরে থাকাকালীন তিনি তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘বৃন্দাবন অন্ধকার’ সৃষ্টি করেন যেটি তাঁকে কবি হিসেবে প্রথম জনপ্রিয়তা এনে দেয়। তিনি ব্রজলীলা বিষয়ে আরও কিছু কবিতা এখানে থেকেই লেখেন।

১৯১৫ সালে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের অর্থানুকুল্যে ‘ব্রজবেণু’ প্রকাশিত হয়। ১৯১৬ সালে ‘ঋতুমঙ্গল’ প্রকাশিত হয় প্রকৃতি ও প্রেমমূলক কবিতার সংগ্রহ নিয়ে। উলিপুরের মহারাজার সাথে মতানৈক্যের কারণে তাঁর প্রধান শিক্ষকের পদপ্রাপ্তি অধরা থেকে যায় এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়ার বই নিয়েও মতানৈক্য ঘটলে তিনি উলিপুর ছেড়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসেন এবং এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়।
কলকাতায় ফিরে তিনি জীবিকার প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে থাকেন। ১৯২৪ সালে কলকাতায় ফেরার পরে ‘হৈমন্তী’ কাব্যগ্রন্হটি রচনা করেন কালিদাস। এরপর ক্রমান্বয়ে ‘বৈকালী’ প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে ‘গীতগোবিন্দ’ এবং ১৯৩২ সালে ‘গীতা লহরী’ প্রকাশ হয়। ১৯৪২ সালে জীবন সায়াহ্নে এসে কিছু কাব্য সমালোচনা গ্রন্থও তিনি প্রকাশ করেন। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, সাহিত্য প্রসঙ্গ পদাবলী সাহিত্য ও শরৎ সাহিত্য যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।১৯১৩ সালে কাশিমবাজার রাজবাড়ীর সাহিত্যসভায় কালিদাস প্রথম রবীন্দ্রনাথের দর্শন পান সেখানেই

রবীন্দ্রনাথের উপদেশানুসারে পরবর্তীতে তিনি অনুবাদ মূলক রচনায় হাত পাকান যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, এবং মেঘদূতের সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ। 'শিশুতোষ গল্পকাহিনীতে' তিনি শিশুদের জন্য গল্প লিখেছেন। তাঁর শিশুসাহিত্যগুলির মধ্যে অন্যতম – 'গাথাঞ্জলি' (১৯৬১), 'গাথাকাহিনী' (১৯৬৪), 'তৃণদল' (১৯৭০) প্রভৃতি। তিনি 'বেতালভট্ট' ছদ্মনামে লিখতেন।কালিদাস রায় শুধুই কবি ছিলেন না তিনি ছিলেন অসাধারণ পন্ডিত। তবে তাঁর পান্ডিত্য কখনও কাউকে হেয় করেনি। তিনি সকলের থেকেই সবরকম মতামত গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন হাস্যরসের যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'পূর্ণাহুতি', 'দন্তরুচি কৌমুদি' ইত্যাদির মধ্যে।কবিশেখর 'রসচক্র' নামে একটি সাহিত্য চক্র গড়ে তুলেছিলেন যেখানে সাহিত্য আলোচনা ছাড়াও বির্তক হত। তার সাথে চলত রঙ্গ রসিকতাও। এই সংগঠনটি ছিল নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের মেলববন্ধনের একটি ক্ষেত্র। তিনি 'বসুধারা' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করতেন সেই সময়।১৯৫৯ সালে দিল্লিতে সাধারণতন্ত্র দিবসে আকাশবাণী আয়োজিত সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনে বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন কালিদাস রায়।কালিদাস রায় তাঁর সারাজীবনের কৃতিত্বের জন্য বহু সম্মাননা লাভ করেছেন। ১৯২০ সালে রংপুর সাহিত্য পরিষদ তাঁকে সাহিত্যে অবদানের জন্য কবিশেখর কালিদাস রায় রবীন্দ্র-ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে তিনি কাব্যচর্চা শুরু করেন। এই ১৯৭৫ সালে টালিগঞ্জে 'সন্ধ্যার কুলায়' নামক নিজস্ব বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রবন্ধ



মূর্খ বড় সামাজিক নয়

শঙ্কর ব্রহ্ম

কবিতার কাছে কি প্রত্যাশা করে, পাঠক?

- কাব্যত্ব?

- কাব্যত্ব কা'কে বলে?

- রসাত্মক বাব্যই কাব্য।

কবিতার ভিতরে কাব্যত্ব কোথায় থাকে? কোন গুণে বা কী কারণে শব্দবন্ধ বা বাক্য রসাত্মক হয়ে ওঠে,বা কাব্য হয়?
কেউ কেউ বলেন, কাব্যের আত্মাই কবিতা।
কাব্যের আত্মা যাই হোক। কাব্যের শরীর হল শব্দবন্ধ বা বাক্য।
অনেকে আবার বলেন- ওই শব্দবন্ধের অর্থ ছাড়া, কাব্যের আর আলাদা কোনাও আত্মা নেই।

বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আটপৌরে না রেখে, সাজ-সজ্জায় সাজিয়ে দিলেই, বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। এই সাজ-সজ্জার নামই অলংকার। শব্দকে অলংকারে যেমন, অনুপ্রাসে সাজিয়ে সুন্দর করে তোলা যায়। বাচ্যের অর্থকে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপকে সাজিয়ে সুন্দর করা যায়। অনেকে আবার ভাবেন, কাব্যের আত্মা অলংকার নয়। তা হলো রীতি বা স্টাইল। পদ রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি। কাব্যে আত্মা তার স্টাইল। 'কাব্যের ইতিহাস হলো তার টেকনিকের ইতিহাস', যেমন আঁরাগ প্রমুখেরা ভাবতেন। টেকনিকের সে ইতিহাস লক্ষ্য করে বলা যায়, ছন্দ সমর্পিত শব্দের নামই কবিতা। দান্তে যেমন বলেছিলেন, 'সুরে বসানো কথাই হল কবিতা।'

অলংকার পরলেই যেমন সবাইকে সুন্দর দেখায় না, যদি না তা তার অবয়বের সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এই অবয়বের সামঞ্জস্যপূর্ণতাই হলো স্টাইল বা রীতি।রমণী দেহের লাবণ্য যেমন অবয়বের চেয়ে,

অলঙ্কারের চেয়ে অতিরিক্ত অন্য কোনো জিনিস,তেমনি মহাকবির রচনা এমন এক বস্তু শব্দ-অর্থ, রচনা ভঙ্গি - এ সবের অতিরিক্ত আরও বেশী কিছু। এই 'অতিরিক্ত আরও কিছু' ই হলো কাব্যের আত্মা।

এই বস্তু আবার কী জিনিস?

বস্তুবাদীরা বলেন, এই জিনিসটি হলো, কাব্যের বাচ্য বা বক্তব্য। কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে ওই বস্তু বা ভাবের বিশিষ্টতার উপর। তারা ভেবে থাকেন সব বস্তু বা সব ভাব কাব্যের বিষয় নয়। বিশেষ বিশেষ বস্তু,বিশেষ বিশেষ রকমের ভাবকে প্রকাশ করলে, তবেই তা কাব্য হয়। বস্তু বা ভাবের মনোহারিত্ব, অভিনবত্ব বাক্যকে কাব্য করে তোলে। যেমন, প্রকৃতি, চাঁদ,নারী,সূর্য,ফুল,পাখি, প্রজাপতি,ভ্রমর,ঋতু বৈচিত্র প্রভৃতি। তেমনই অনেক রকম ভাব আছে, যা মনকে আকৃষ্ট করে। যেমন অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রেম,ভক্তি,বীরত্ব,করুণা, মহত্ব, মানবতা প্রভৃতি।

কবিরা, এইসব বিশিষ্ট ভাব বা বস্তুকে কাব্য প্রকাশ করেন। তাদের প্রকাশের বিশিষ্টতায় (স্টাইল) তা যখন ভাব ও বস্তকে আরও মনোজ্ঞ করে তোলে,তখনই তা কাব্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, ভাব-বস্তু-রীতি-অলংকার এদের যথার্থ সমন্বয়েইকাব্যের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া আর অতিরিক্ত কাব্যের আত্মা বলে কিছ নেই।
যেমন রক্ত, মাংস, মজ্জা ইত্যাদি উপাদানের যথার্থ সমন্বয়েই মানব দেহে চেতনার উদ্ভব ঘটে, মন নামে আলাদা কোনা বস্তু নেই। অনেকে আবার এই মতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। কারণ তারা দেখেছেন, ভাল কবিতার প্রকৃতিই হচ্ছে বাচ্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া। শব্দার্থে যতটুকু প্রকাশ হয়, সেই কথ্য-বস্তু (বক্তব্য)-টুকই কাব্যের প্রধান কথা নয়। তা যদি হতো, তবে শব্দার্থের জ্ঞান আছে, এমন যে কোনও ব্যক্তিই কাব্যের আস্বাদ নিতে পারতেন। কিন্তু তা হয় না।

ভালো কবিতা নিজের বাচ্যার্থে আটকে না থেকে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা বহন করে। তাকে 'ধ্বনি' বলেন আলঙ্করিকরা। কবিরা বলেন 'রস'। কাব্য হচ্ছে সেই সব শব্দ-বন্ধ বা বাক্য, 'রস' যার আত্মা। এই জন্যই বলে, রসাত্মক বাক্যই কাব্য।

রসবোধ সব সময় বিদ্যা-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না। তাকে বিদ্যা-বৃদ্ধির দ্বারা বিচার করে, মাপ-জোপ করে দেখে কিছুই বোঝার উপায় থাকে না। হৃদয়ের ভিতরে রসবোধ না থাকলে, তা উপলব্ধি করা যায় না। এই জন্যই বলে বোধহয়,'রসিক বোঝে রসের মর্ম, বে-রসিকে তার পায় না স্বাদ।

কাব্যের রস বিচার করে, সব সময় পাঠক তার থেকে কাব্য-রসের স্বাদ পায় না, সেই আস্বাদ পায় রসিক পাঠক, দরদী মনের অনুভূতি মিশিয়ে। সহৃদয় পাঠক, কাব্যানুশীলনের অভ্যাসে, সে রস আস্বাদনের যোগ্য হয়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায়, কাব্যরসের আধার-কাব্যও নয়, কবিও নয়। তা হলো রসিক কাব্য পাঠকের মন। রসবোধ এক ধরনের মানসিক অবস্থান বলা চলে। কী করে মনে, এ অবস্থার উদ্ভুব ঘটে?

দার্শনিক কান্ট, জ্ঞানের উৎপত্তি বিশ্রষণ করে দেখিয়েছেন, তাতে দু'ধরনের উপাদান থাকে, মানসিক ও বাহ্যিক।বাইরের উপাদান ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনে প্রবেশ করে, কিন্তু তা জ্ঞান নয়। জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে, যখন মনের কতগুলি তত্ত্ব, ওই বাহ্যিক উপাদানের উপর কাজ করে, বিশেষ পরিণতি বা আকার দেয়। এই সব তত্ত্ব মন বাইরে থেকে আহরণ করে না। নিজের ভেতর থেকে এনে বাইরের জিনিষের উপর তার প্রভাব ফেলে। যেমন, রোদের তাপে মাথা গরম হয়। এই জ্ঞানের বাহ্যিক উপাদান রোদ, আগেকার অবস্থার ঠান্ডা মাথা এবং পরের অবস্থার মাথা গরম ভাব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনে প্রবেশ কর। কিন্তু রোদ এবং গরম মাথার সম্পর্কটি অর্থাৎ ওদেরকার্য-কারণ সম্বন্ধে মনের দান। এই কার্য-কারণ তত্বের প্রয়োগেই বাহ্যিক উপাদান জ্ঞানে পরিণত হয়েছে।

উল্টোভাবে বলা চলে, ঐ বাহ্যিক উপাদান-ই মনোগত সাধারণ কার্য-কারণ তত্ত্বকে বিশেষ কার্যকারণের জ্ঞানে পরিণত করে এবং জ্ঞানের অথই হলো, বিশেষ জ্ঞান। বাহ্যিক উপাদান এবং মানসিক তত্ত্ব- এই দুয়ের সংযোগ হলে, তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। একটিকে ছাড়া, অন্যটি অস্তিত্বহীন।

রসের বিশ্লেষণেও এই দুই ধরনের উপাদান রয়েছে, মানসিক ও বাহ্যক। রসের মানসিক উপাদান হল মনের ভাব বা ইমোশনগুলি। আর বাহ্যিক উপাদানগুলি, জ্ঞানের বাহ্যিক উপাদানের মতো, বাইরের লৌকিক জগৎ থেকে আসে না। আসে কবির সৃষ্ট কাব্য-জগৎ থেকে। কাব্য-জগতের ওই বাহ্যিক উপাদানের ক্রিয়ায় মনের ভাবে রূপান্তরিত হয়ে, রসে পরিণত হয়। সুতরাং রস জিনিষটি লৌকিক বস্তু নয়। মনের যে সব ভাব রসে রূপান্তরিত হয়, তারা অবশ্যই লৌকিক।
শোক একটি মানসিক ভাব বা ইমোশন। লৌকিক জগতের বাহ্যিক কারণে, মনে শোকের জন্ম হলে, মানুষ শোকার্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু শোকার্ত লোকের মনের শোক, তার কাছে রস নয় এবং সে শোকের কারণটিও কাব্য নয়।

কিন্তু কবি যখন তার প্রতিভার মায়াবলে, এই লৌকিক শোক ও তার লৌকিক কারণের, এক অলৌকিক চিত্রকল্প ফুটিয়ে তোলেন, তখনই রসিক পাঠকের মনে, রসের উদয় হয়। যার নাম-করুণ রস। এই করুণ রস শোকের ইমোশন নয়।

শোক হচ্ছে দুঃখদায়ক। কিন্তু কবির কাব্য পাঠে, মনে যে করুণ রসের সঞ্চার হয়, তা চোখে জল আনলেও, মনকে অপূর্ব আনন্দে ভরিয়ে তোলে। এ' কথা, কাব্যের আস্বাদ যার আছে, সে-ই জানে। কিন্তু তা কাউকে প্রমাণ করে বোঝানো কঠিন। কারণ, করুণা রসে মনে যে অদ্ভুত শখ জন্মে, তার একমাত্র প্রমাণ হৃদয়বান লোকের অনুভূতিতে। করুণ রস শুধুমাত্র দুঃখের কারণ হলে, রাময়ণ পাঠে কেউ আর আগ্রহ বোধ করত না।

'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought' যথার্থ কথাই বলেছেন কবি। তবে মনে রাখতে হবে, tell of saddest thought, যে বাস্তব ঘটনা মনে সোজাসুজি Sad thotght আনে, তা sweet ও নয় song-ও নয়। কবি যখন, সেই Saddest thought-এর কথা কাব্যে তুলে ধরেন, নানা রূপকল্পে, তখনই তা Sweetest song-য়ে রূপাস্তবিত হয়।

রস বা কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ। কবি তাঁর কাব্যে যে মায়া জগৎ সৃষ্টি করেন, তার কৌশল কী?;এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর অসম্ভব। কারণ, প্রত্যেক সার্থক কাব্য, এক বিশেষ সৃজন, কলের (machine) তৈরি জিনিস নয়।

প্রেমিকের মনে যে প্রেমের উদ্ভব হয়,তা রসও নয়,কাব্যও নয়। কারণ তা প্রেমিকের ব্যক্তিগত হদয়ে আবদ্ধ। সুতরাং তা পরিমিত। তা লৌকিক। অতএব রস বোধের অন্তরায়। কবি যখন প্রতিভার মায়ায়, এই পরিমিত লৌকিক ভাবকে 'সকল সহৃদয় হৃদয় সংবাহী' আলৌকিক রস মুর্তিতে রূপান্তর ঘটান, তখন তা কাব্য হয়ে ওঠে। পাঠকের মনেহয়, কাব্যের চরিত্র এবং ভাব পরের, কিন্তু সম্পূর্ণ পরের নয়, কিছুটা আমার নিজেরও, কিন্তু সম্পূর্ণ নিজেরও নয়।

আজকের দিনে মহাকাব্যে লেখা হয় না বললেই চলে। লিরিক কাব্য লেখা হয়। এখন যখন কবির নিজের মনের ভাবই কাব্যের উপাদান, তখন এ'ভূল সহজেই ঘটে দেখি, কবির হৃদয়ের ভাবকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করাই বুঝি কবির লক্ষ্য। এবং যে কবির ভাব যত তীব্র, যত আবেগময়, তার কাব্য সৃষ্টিও তত সার্থক। তাই যদি হতো, তা হলে সাম্প্রদায়িকতা জিগিরের উম্মত্ত উত্তেজক সব ভাষণই উৎকৃষ্ট কাব্য বলে বিবেচিত হত। কারণ, তাতে সাম্প্রদায়িকতার জিঘাংসা ও ক্রোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে।

লোকে যদি আলো চায়, তবে তাকে জ্বালতে হয় বাতি (লাইট), তেমনি কবির লক্ষ্য যদিও রস সৃষ্টি, কিন্তু তার জন্য তাকে সৃষ্টি করতে হয় কাব্যের শব্দার্থময় কথা। এই কথাবস্তু যদি সহৃদয় পাঠকের মনে, অভিপ্রেত রস সঞ্চার করে, তবেই কবির কাজ সার্থক হয়। এর বেশি তার সাধ্যের বাইরে। কারণ, কাব্য কোনও পাঠক-বিশেষের মনে রসের উদ্রেক ঘটাবে কিনা, তা কেবল কাব্যের উপর নির্ভর করে না, পাঠকের মনের রুচির উপরও নির্ভর করে।

কবি যে ভাবকে রসমূর্তিতে রূপ দিতে চান, যদি পাঠকের মন সে ভাব সম্পর্কে কতকটাও কবির মনের সহমর্মী না হয়, তবে সে পাঠকের কাছে কাব্য ব্যর্থ। কাব্য যে ভাবকে, রসে পরিণত করতে চায়, পাঠকের মনে তার কোনও ধারণাই যদি না থাকে, তবে তার বয়স যতই হোক, সে কাব্য সম্বন্ধে শিশু। অর্থাৎ ওই কাব্য তার জন্য নয়। মনে ভাব থাকলেই যে রসের আস্বাদন হবে, এমন আবার নাও হতে পারে। যদি তার কাব্য পাঠের অভ্যাস না থাকে।

কাব্যের লক্ষ্য রস। শব্দ-বক্তব্য-স্টাইল-অলংকার তার উপায় মাত্র। এই উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে এক যাদু প্রক্রিয়া বিদ্যমান, যা সকলেই বোঝে না, কেবল মাত্র কবিমনই বুঝতে পারে। এ জন্য কাব্যে পাঠে অভ্যস্থ পাঠকের কাছে যে ব্যঞ্জনা ধরা পড়ে, সকলের কাছে তা ধরা পড়া সম্ভব নয়।

অবশ্য বেরসিকের কাছে এর কোন মূল্য নাও থাকতে পারে। যেমন, উদাহরণ স্বরূপ একটি বাস্তব ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করি। আমার এক তরুণ বন্ধু-সুশিক্ষিত, মার্জিত, রুচিবোধ সম্পন্ন, কম্প্যুটারে পারদর্শী, আই. টি সেক্টরে কর্মরত। একদিন কথায় কথায় আমায় বলল, তোমরা কবিতা কবিতা করে এমন মাতামাতি করো কেন বলো তো? কী মজা পাও আধুনিক কবিতা পড়ে? আমি তো পড়ে ছাই কিছুই বুঝি না। আমি তখন তাকে বলি। তাহলে তোমাকে একটা কবিতা বলি-

'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিয়াছি পৃথিবীর পথে
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ;
আরো দূরে অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;আমি ক্লান্ত প্রাণ এক,
চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সযফন,
আমাদের দুদন্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।'

বন্ধু শুনে বলে উঠলো, আরে থামো থামো। এতো পাগলের প্রলাপ | চলতি ছোকরাদের ভাষায়, ভাট বকা। হাজার বছর কেউ বাঁচে যে সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে, বিম্বিসার -অশোকের ধূসর জগতে ঘুরবে? ঘুরে ক্লান্ত হবে, তারপর বনলতা সেনের দেখা পেয়ে শান্তি পাবে। আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি, এ তো কবির কল্পনা।

সে শুনে বলে, একেবারে অবাস্তব কল্পনা। যার কোনও মাথা মুন্ড নেই। তার চেয়ে বললেই পারতো -

'লক্ষ বছর ধরে আমি তো আদম হয়ে ঘুরে ফিরি সমুদ্রে জঙ্গলে
নিবিড় শান্তি পেতে দু'দন্ডের তরে, ইভকে যে খুঁজে পাই অকস্মাৎ
নিষিদ্ধ ফলে।

এরপর আমি আর কোনোদিন ওকে ভুলেও কবিতার রস গেলাতে যাইনি। কারণ সে কোনও দিনই বুঝাবে না কবিতার ব্যঞ্জনা। কবিতার রস আস্বাদন করার মতোন মনটাই ওর তৈবি হয়ে ওঠেনি। অথবা মনটাকে ও সেভাবে তৈরী করে তোলবার কথা ভাবেনি। তাই কবিতার রস সকলের জন্য নয়। যেমন 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।' তেমনি সকলেই কবিতার পাঠক নয় কেউ কেউ কাব্য-পাঠক। এই জন্যই গল্প-উপন্যাসের মতো কখনোই কবিতার বইয়ের বাজার থাকে না। কবিতার বই বিক্রি, এতো কম হয়।

কবিতার ভাষা, স্টাইল বা অলঙ্কার প্রয়োোগের কোনও বাধা ধরা নিয়ম নেই। নিয়ম থাকা সম্ভবও নয়। কেননা রস ছাড়া এদের আর কোনো আলাদা মূল্য নেই।

প্রাচীন কবিদের কাব্য বিচার করে, যদিও তার কাব্য থেকে কোনও কোনও সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা যায়, নতুন কবিদের ক্ষেত্রে সে নিয়ম প্রযোজ্য নাও হতে পারে। কারণ, তাদের কাব্য প্রতিভা সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে চলেও, সার্থক কাব্য সৃষ্টি করতে পারে।

কাব্যের বিষয় সম্পর্কেও এই একই ব্যাপার। কী নিয়ে কবি কাব্য রচনা করবেন, তা কারও পক্ষই বলে দেওয়া সম্ভব নয়। কোন 'অপূর্ব কথা বস্তু সৃষ্টি করে, রসকে আকর্ষণ করবে, আগে থেকে কে তা নির্ণয় করতে পারে? কারণ, এমন কোনও বিষয় নেই, যা রসিক কবি প্রকাশ-উপযোগী করে তুলতে পারেন না। বস্তু জগতের মতো কাব্য জগতও সীমাহীন। কাব্যে, কবির ব্যবহার স্বাধীন, বাইরের কোনও কিছুর আনুগত্য তাকে মানতে বাধ্য করা চলে না।

কবি জীবনানন্দ দাশ বলতেন, 'কাব্যের ছন্দ তো অনেক রকম; গদ্যও ছন্দও তো একরকম ছন্দ। কবি যখন ভারাক্রান্ত হন, তখন চোখ তার ছবি দেখে, কান শোনে ছন্দ এবং চোখও অনুভব করে যেন ছন্দ বিদ্যুৎ। কোন ছন্দে কবিতাটি রচিত হবে মুহুর্তের ভিতরেই নির্ণীত হয়ে যায় অনেক সময়।

কাব্যের লক্ষ্য হলো রস। রস হলো ভাবের পরিণতি। কিন্তু ভাব কোন নিরালম্ব জিনিস নয়। বস্তুকে আশ্রয় করেই তা জন্মায় এবং বেঁচে থাকে। কবি ভাবের এই বস্তুকে কথা-শরীর দিয়েই রসের উদ্বোধন ঘটান। সুতরাং কাব্যের কথা-বস্তু যদি ভাবের প্রকৃত বস্তুর যথার্থ চিত্রণ না হয়, তবে রসের উদ্বোধনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। বর্ণনা এমন হবে যাতে পাঠকের অনুভূতি রঞ্জিত হয়।

কবি জীবনান্দ দাশ ভাবতেন, "কবিতা সৃষ্টির জন্য নিজেদের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে গিয়ে ও সেই কবিতা সৃষ্টি করবার সময় উপরোক্ত সামাজিক লাভ-অলাভের প্রশ্ন কবির বড় চেতনায় বিশেষ কোনো ছায়াপাতই করে না, তার চৈতন্য ও অনুচেতনা ঐকান্তিকভাবে সক্রিয় থাকে কবিতাটিকে সৎ, সার্থক করে তোলার জন্য।'

কাব্যের জগৎ তাই সমস্তাটাই বস্তুর জগৎ নয়। খানিকটা মায়ারও জগৎ। তাই বলা চলে, 'রামের জন্মভূমি সত্য, কবির মনোভূমি -- তার চেয়েও বেশি সত্য।'

মহাকবি বাল্মীকির কাছে, রামের জন্মভূমি যতটা সত্য ছিল তার চেয়ে বেশি সত্য ছিল তার মনোভূমি। না হলে তার সৃজনকর্ম "রামায়ণ' মহাকাব্য না হয়ে, শুধুমাত্র ইতিহাস গ্রন্থ বলেই বিবেচিত হতো আজ। আনেকে আবার বলেন, রামের জন্মের আগেই নাকি মহাকবি রামায়ণ রচনা করেছিলেন।

কথা বস্তুর লক্ষ্য - বস্তু নয়, রস। কাব্যে যে বস্তুকে তুলে ধরা হয়, তা বস্তুর জন্য নয়,রস সৃষ্টির জন্য। কাজেই উপায় যদি উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে যায়, তবে কাব্যের রস-হানি ঘটে। কাব্যের উৎকর্ষতা হ্রাস পায়। বস্তুর বাস্তবতা অনন্ত। কোনও কবিই তার সবটুকু কাব্যের কথাবস্তুতে স্থান দিতে পারেন না। যদি পারতেন, তবে তার সৃষ্টি আর যাই হাক কাব্য হতো না। সুতরাং বাস্তবতার কতটুকু কাব্যে স্থান পাবে, তা নির্ভর করে, সেই কাব্যের উদ্দিষ্ট রসের উপর, এবং বিশেষ করে কবি প্রতিভার বিশেষত্বের উপর। বস্তুর বাস্তবতার যে অংশ কাব্যের রসকে পরিপুষ্ট করতে পারে না, সেই অংশ কবিতার ভার, বোঝা। তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

বস্তুতস্ত্র এবং ভাবতন্ত্র রস সৃষ্টির দুই ভিন্ন কৌশল। কোন কবি, কোন কাব্যে, কোন কৌশল অবলম্বন করবেন তা নির্ভর করে তার রুচি এবং প্রতিভার বিশেষত্বের উপর। এই দুই কৌশলের মধ্যে সৃষ্ট রসের আস্বাদের ভিতরে প্রভেদ থাকলেও রসত্বের প্রভেদ নেই। সুতরাং কেউ, কাউকে ছোট ভাবলে,

সেটা অবশ্যই ভুল করা হবে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, প্রথাগত ধারায় রচিত কবিতা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ধারায় সৃষ্ট কবিতা, যখন দুটি ধারাই একসঙ্গে বহমান থাকে, তখন দুটি ধারার দিকেই সমান দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং কাউকে অগ্রাহ্য করা ভুল হবে। একটাকে বাদ দিয়ে অথবা একটা শুধু পড়লে, রুচির প্রসার ঘটবে না। তবে এক আস্বাদের রসে অরুচি হলে,কিছুদিনের জন্য পাঠক অন্য রসের স্বাদ নিতে পারেন। খেজুরে অরুচি হলে তেঁতুলের স্বাদগ্রহণে বাধা নেই কোনও।

কাব্যের সঙ্গে কাব্যের ছোট বড়োর ভেদ, মূলত রসের তারতাম্য নিয়ে। কাব্য আর অকাব্যের ভেদ, এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

কাব্যে রস সৃষ্টির যে সব উপাদান যথা শব্দ, স্টাইল, অলংকার, ছন্দ - সে একই মাল মসলা দিয়ে রচিত রচনা, অথচ যাতে রস নেই, তা হচ্ছে অকাব্য। কেউ কেউ আবার তাকে বলে থাকেন 'চিত্র-কাব্য। চিত্র যেমন বস্তুর অনুকরণ কিন্তু বস্তু নয়, এও তেমনি কাব্যের অনুকরণ অথচ কাব্য নয়। এ রকম অকাব্য যে রচিত হয়, তার কারণ অনেক। প্রধান কারণ,রস সৃষ্টির প্রতিভা যার নেই, অথচ তার কাব্য রচনার ইচ্ছে আছে ষোল আনা। এই ইচ্ছের বেগে সে যা রচনা করে চলে, তা কাব্য হয় না, হয় কাব্যের ছায়ামূর্তি মাত্র। এই জন্যই, সমসমায়িক যশঃপ্রার্থী কবিরা কেউ কেউ, পূর্বসূরী কোনো প্রভাবশালী কবির 'ভাষা-ছন্দ-ভঙ্গি' র ব্যর্থ অনুকরণ করে সফল হতে চায়। কারণ তাদের মনের ভরসা, কতকটা ওই রকম, মূর্তি গড়তে পারলেই, তার মধ্যে রস সঞ্চার আপনা থেকেই হয়ে যাবে।

সত্যি বলত কী, তা কখনোই হয় না, ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। আবার অনেকে আছেন, যাদের কাব্য রচনার উদ্দেশ্য- উপদেশ দেওয়া, প্রচার করা, মানুষের বুদ্ধির কাছে কোনো সত্যকে তুলে ধরা। যেমন পোপের, 'এসে অন ম্যান' অথবা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্ভাব শতক কিংবা খনার বচন, এইসব রচনাকে কাব্যের আকারে গড়লেও, রস এখানে উপায় মাত্র, বক্তব্যই মূল

প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং এ'গুলি কাব্য নয়। কাব্যের ছদ্মবেশ মাত্র। পদ্য বলা চলে। কবিতায় রসই প্রধান উপপাদ্য বিষয়। কাব্যে ব্যবহৃত অন্য আর সবকিছুই তার উপায় বা উপাদান মাত্র। প্রসঙ্গতঃ কবি জীবনানন্দ দাশের কথা মনে পড়ে। তিনি বলতেন, 'কবিতা মুখ্যত লোকশিক্ষা নয়, কিংবা লোকশিক্ষাকে রসে মন্ডিত করে পরিবেশন - না, তাও নয়। কবির সে রকম কোনও উদ্দশ্য নেই।

অ্যারিস্টটল জানতেন যে, বিসাদৃশ্যের মধ্য সাদৃশ্যের সন্ধান যে কবির ক্ষমতায় কুলায় না, সে প্রতিভায় বঞ্চিত।

আজকের দিনে মানুষের কাছে, সমাজ বন্ধন এবং সমাজ ব্যবস্থা (অর্থনীতি,রাজনীতি)খুব বড় হয়ে উঠেছে। এত বড়, যেন মনে হয় মানুষের সব প্রচেষ্টা,সমত্ত সৃষ্টির ওটাই হচ্ছে চরম লক্ষ্য। কিন্তু যে সব সৃষ্টি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সমাজের কোনও কাজ লাগে না, তার যে কোনও মূল্য আছে, সে কথা ভাবা অনেকের পক্ষেই কঠিন হয়ে পড়ে।

কিছু লোকের ধারণা, পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থা একদিন সমস্ত মানুষকে দুর্দশাহীন, সকল রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দের অধিকারী করে তুলবে। সুতরাং তাদের দাবী কবিদের উপর বেড়ে গেছে। তাদের সেই দাবী- কবির রস সৃষ্টির শক্তি এই সমাজ সংসারের মঙ্গল সাধনের জন্য নিয়োজিত করা হোক। এ দাবী অসঙ্গতও নয়। লৌকিকে জীবনের উপর যে কবিতার প্রভাব নেই, তা তো নয়। কিন্তু সে ফল জীবনের পুষ্টিতে নয়, মানবিক মুক্তিতে। আমাদের আত্ম -উপলব্ধি আরও গভীর, আরাও বিস্তৃত করা ছাড়া কবিতার অন্য আর কোনো উদ্দেশ্য না থাকাটাই বাঞ্ছনীয়।

কবি রসের ছলে উপদেশ দেন। ওই কথা যেমন সত্য নয়, তেমনি কাব্য রসের সাহায্যে সত্যকে প্রকাশ করেন এ কথাও মিথ্যে। সত্য - কাব্যের লক্ষ্য নয়, রসের উপাদান মাত্র।

কবি বা শিল্পী, নেতা নন, সমাজ সংস্কারকও নন। তার কাজ সমস্যার সমাধান বাতলে দেওয়া নয়। শুধু তা শিল্প সুষমায়

প্রকাশ করে দেওয়া। বক্তব্যে উপদেশ দেওয়া নয়, সমাজের ক্ষতটা রসমন্ডিত করে তুলে ধরা। 'অপরের সঙ্গে আমাদের যে কলহ, তা থেকে আমরা ভাষার অলঙ্কার পাই, আর নিজের সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব, তা থেকে কবিতা।'- বলেছেন কবি ইয়েটস।

কবিতায় উপদেশ দেওয়া, শিক্ষা দেওয়ার কাজ কবির পক্ষে যথার্থ নয়। সে কাজ অপরের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। শিল্পী যখন পাথর কুঁদে কুঁদে একটি মূর্তির প্রকাশ ঘটান, তখন কেউ তাকে বলেন না যে মূর্তির মধ্য দিয়ে সে পাথরকে প্রকাশ করেছেন। এও তেমনি দৃষ্টি বিভ্রম মাত্র।

তাহলে এখন প্রশ্ন, কাব্য সংসার জীবন বা সমাজের কাজে কতটা লাগে? কবি বলেন, কোনও কাজেই লাগে না। কাব্যের প্রধান কাজ রসিক পাঠকের মনে আনন্দ লহরী তোলা ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। কেউ যদি তার থোকে সংসার জীবন কিংবা সমাজের জন্য কিছু পান, তা তার বাড়তি পাওনা। এ'জন্য কবিকে কেউ কেউ অসামাজিক জীবও ভাবতে পারেন। মূর্খও ভাবতে পারেন। তা'তে প্রকৃত কবি দুঃখ পাবেন বলে মনে হয় না।

কবিতা কখনোই তত্ত্বকে প্রমাণ করে না। সে তত্ত্বকে রূপদান করে মাত্র। সবসময় যে তাও করে, তা নয়। তত্ত্ব হোক বা না হোক, একটা কিছু যে কোনও রস বস্তুকে, সে আপনার কল্পনায় ও ভাবে - ছাঁচে ফেলে, একটা সুষমাময় রূপে গড়ে গড়ে তুলতে পারলেই সে খুশি।

সে ভাবকে ধরতে চায় না, অভাবনীয়কে ধরতে চায়। এই জন্য সে যে রস সৃষ্টি করে, তার মধ্যে আসল ভাবটা কি, তা উদ্ধার করা এত কঠিন। মুখে যেমন মনের নানা ভাবের আলো-ছায়ার কারুশিল্প দেখা যায়, কবিতার মধ্য দিয়ে তেমনি ভাবের নানা ইশারা ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যায় মাত্র, তার বেশি কিছু নয়।

ঋণস্বীকার - অতুলচন্দ্র গুপ্ত

শিক্ষিকা এবং কণ্ঠশিল্পী জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আলাপচারিতায় সোমাশ্রী



মানুষ বাঁকা নজরে তাকায়। আমাদের
রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা এমনই যে বাঁকা
নজরে তাকানোটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

১. প্রথমেই তোমাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই তুমি এর কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের এই নবোদয় পত্রিকার জন্য সময় বের করেছো। তুমি একাধারে শিক্ষিকা, কণ্ঠশিল্পী আবার লেখিকাও। কিভাবে সামলাও সব দিক?

(একটু হেসে), হ্যাঁ শিক্ষিকা। কণ্ঠ দেওয়ার চেষ্টা করি তবে শিল্পী হয়ে উঠতে পেরেছি কিনা জানি না। তবে লেখিকা বলব না। মাঝে মধ্যে যেটুকু মাথায় আসে লিখে ফেলি। আসলে সবটাই সময়ের ব্যাপার। সময়টা কে যদি ঠিক করে ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমার মনের যে আকাঙ্ক্ষা, যে চাহিদা যে তৃপ্তি তাকে ঠিকঠাক ভাবে বহন করতে পারব। এই কর্মব্যস্ততা আছে বলেই আমি এখনো টিকে আছি। আমি সবদিকটাই সামলানোর চেষ্টা করে চলেছি। আর এটা করতে পারছি আমার চারিপাশের মানুষগুলোর সাপোর্টের জন্য।

২.ছোটবেলাটা তোমার কেমন ছিল? শান্ত ছিলে নাকি দুরন্ত? তখন থেকেই কি আবৃত্তির প্রতি আগ্রহ ছিল?

ছোটবেলায় আমি ভীষণ দুরন্ত ছিলাম এতটাই দুরন্ত যে মা সামলাতে গিয়ে হিমসিম খেতেন। আবৃত্তির প্রতি আগ্রহ তো বরাবরই ছিল। স্কুলে বন্ধুদের দেখে খুব ইচ্ছা করত আবৃত্তি শিখতে। কিন্তু আমার এলাকায় কেউ ছিলেন না শেখানোর জন্য। তাই বাড়িতে আমি নিজে নিজে কবিতা পাঠ করতাম।

৩.পড়াশুনার পাশাপাশি কি কি করতে ছোটবেলায়?

পড়াশুনার পাশাপাশি আমি ছোটবেলায় নানা বিষয়ে যুক্ত ছিলাম। যেমন আমি বারো তেরো বছর গানের চর্চা করেছি। পাশাপাশি নাচ করেছি। আঁকাতেও আমাকে ভর্তি করা হয়েছিল। পাশাপাশি আমাকে যোগব্যায়ামও শেখানো হতো। এছাড়া স্কুলে খেলাধুলা তো ছিলই সর্বক্ষণের সাথী। এছাড়া প্রচুর বই পড়তাম। গল্পের বই, কবিতার বই, নানা পত্রপত্রিকা, যা পেতাম পড়তাম।

আসলে ছোটবেলায় আমার বাবা আমাকে বই পড়ার এমন নেশা ধরিয়েছিলেন যে আমি বই ছাড়া কিছু ভাবতে পারতাম না।

৪. এখন তুমি শিক্ষিকা, কিন্তু তুমি যখন ছোট ছিলে তখন শিক্ষিকাদের সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন ছিল?

আমার জীবনের প্রথম শিক্ষক শিক্ষিকা আমার বাবা - মা। ছোটবেলায় আমি বাবার কথা ছাড়া আর কারো কথা শুনতাম না। এরপর স্কুলে ভর্তি হলাম ডোমজুর এলাকার নেহেরু গার্লস হাই স্কুলে। সেখানে শিক্ষিকারা ভীষণ ভালোবাসতেন আমাকে। যেমন কাজলদি, অসীমাদি, চন্দ্রিমাদি, ডালিয়াদি সহ আরোও অনেকে ছিলেন। স্কুলে যেকোনো অনুষ্ঠানে আমি স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতাম। আর এই বিষয়টি দিদিরা খুব ভালোবাসতেন। এইভাবেই মুখ চেনা হয়ে যায় দিদিদের। স্কুলের পরবর্তী কালে আরোও অনেককে পেয়েছি যেমন কৌশিক চট্টোপাধ্যায় আমার ইংরাজি স্যার। পড়ানোর পাশাপাশি উনি ভীষণ ভালো গান করেন। এছাড়া সৌরভ মুখোপাধ্যায়, একজন খুব ভালো লেখক। এছাড়া সুশান্ত স্যার। এঁরা ছিলেন বলেই আজ আমার শিক্ষিকা হয়ে ওঠার স্বপ্নপূরণ হয়েছে।

৫. তোমাকে প্রায়ই দেখি বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটাতে সোশ্যাল মিডিয়ায়, ওদের সঙ্গে সময় কাটাতে কেমন লাগে? ওদের কে কবিতা শোনাও? ওরা তোমার থেকে কবিতা শেখে?

সোশ্যাল মিডিয়ায় আমি বাচ্চাদের সাথে সময় কাটাই না। ওদের সাথে আমি প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে অবধি সময় কাটাই। এটাই আমসেখাইদশা। তবে কাটাতে হয় বলে কাটাই না, স্কুল আমার কাছে একটা খুবই ভালো লাগার জায়গা। এখানে আমি আমার সম্পূর্ণটা ওদের সাথে ভাগ করে নিতে পারি। তবে ওরা সবটা গ্রহণ করতে না পারলেও আমি চেষ্টা করি যাতে ওরা কিছুটা গ্রহণ করতে পারে।

হ্যাঁ ওদের কবিতা শোনাই। ওদের শেখাই। তবে আমি যখন কবিতা বলি বা ওদের শেখাই , তখন ওরা হা করে শোনে আর বোঝার চেষ্টা করে ম্যাম কি করছেন। আসলে ওরা এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তবে এখনকার বাচ্চারা ইউ টিউবের মাধ্যমে অনেক কিছুই শিখে ফেলে। কিন্তু আমি যখন ওদের সামনাসামনি বসে শেখাই তখন তার অনুভূতিটাই অন্যরকম হয়। কোনোদিন হয়তো আমার পড়াতে ইচ্ছা করছে না কিন্তু সিলেবাস শেষ করার জন্য পড়াতেই হবে। আমি তখন সেই বিষয়ের ওপর কিছু কবিতা ওদের শোনাই। ওরা কিছুক্ষণ পর বলে ম্যাম আপনি কি গল্প বলছেন? ওরা ঠিক আবৃত্তিটাকে ধরতে পারে না। কিন্তু ওদের কোনো বিষয় বোঝাতে আবৃত্তি আমাকে খুবই সাহায্য করে।

৬.এখন চারিদিকে শিক্ষিকা বললেই মানুষ একটু বাঁকা নজরে তাকায়, এটা কি তোমার সঙ্গে হয়েছে কখনো?

হ্যাঁ মানুষ বাঁকা নজরে তাকায়। আমাদের রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা এমনই যে বাঁকা নজরে তাকানোটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তুমি ঠিক থাকলেই হলো। এরপর মানুষ কিছু বললে সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন নেই।

৭.কবিতা আবৃত্তি শেখার প্রতি আগ্রহ তোমার কবে থেকে হলো?

চাকরি পাওয়ার পর থেকেই আমি আবৃত্তির সাথে জড়িত। এই ধরো প্রায় পনেরো বছর ধরে আমি আবৃত্তির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে জড়িত আছি।

৮. তোমার এই আবৃত্তি চর্চায় বর কতটা সাপোর্ট করে?

বরের সাপোর্ট আছে বলেই আজ আমি এত দূর আসতে পেরেছি। আবৃত্তির জন্য সময় দিতে পারি, নিয়মিত চর্চা করতে

বর এবং আমার পরিবারের লোকজনের সাপোর্টের কারণেই আমি আবৃত্তি নিয়ে এগোতে পারছি

৯. এখন তো রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে গিয়ে তুমি অনুষ্ঠান করো, কেমন অভিজ্ঞতা হয়? নতুন শিল্পী বলে কখনো তাচ্ছিল্য পেয়েছ?

হ্যাঁ রাজ্য এবং বাইরে আমি অনুষ্ঠান করেছি। সেখানে অভিজ্ঞতাও বেশ ভালো। অনেক মানুষের প্রশংসা পেয়েছি। অনেকে বলেন মেয়েটা খুব সুন্দর কবিতা বলে। আমি তাদের জানিয়েছি, যে কবিতা তো কবির কলমে লেখা হয়, আমি তো আবৃত্তি করি, কবিতা আমার আসে না, আবৃত্তিটাই আসে। তবে নতুন শিল্পী বলে তাচ্ছিল্য পায়নি কখনও। আর নিন্দা যদি পেয়েও থাকি তাহলেও আমি সাদরে তা গ্রহণ করি। সকলে যদি প্রসংশা করে, তাহলে ভুল ধরবে কে? তাই না!



১০. টিভির পর্দায়ও তোমায় দেখা গেছিলো সেখানে তোমার অভিজ্ঞতা কেমন?

হ্যাঁ কথাকলি শর্মিষ্ঠা দির সঞ্চালনায় আমি একটি অনুষ্ঠানে কাজ করেছি। বেশ ভালই লেগেছিল টিভির পর্দায় নিজেকে দেখতে। চেষ্টা করেছিলাম ভালো করে নিজেকে তুলে ধরতে। টোবেভাজকে যখন সেদিনের কাজগুলো শুনি তখন মনে হয় আরেকটু ভালো করে প্রস্তুতি নিলে বোধহয় আরও ভালো করতে পারতাম। এছাড়া আরো কিছু চ্যানেলে কাজ করেছি এবং কিছু কাজ চলছে।

১১. তুমি শুধু আবৃত্তি করো না , কবিতাও লেখো। ইতিমধ্যে তোমার কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। একক বই কবে পাবে তোমার অনুসারীরা?

হ্যাঁ টুকটাক লিখতাম। কিছু পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছি। তবে এখন একটু ভ্রমণের দিকে মন দিয়েছি, তাই লেখা বন্ধ আছে। এছাড়া টার্মিনাস পরিবার থেকে আমার একক কবিতার বই 'স্যাকা অতীত ' গত বছর বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছিল। শুনেছিলাম মানুষজন কিনেও ছিলেন এবং তাদের ভালো লেগেছিল। বেশ ভালো লেগেছিল।

১২. এর পাশাপাশি তুমি ঘুরতেও খুব ভালোবাসো, প্রায়ই বেরিয়ে পড়ো, এতো এনার্জি কোথা থেকে পাও?

ঘুরতে আমি মারাত্মক ভালবাসি। ছোটবেলা থেকে বাবা যে সাংঘাতিক নেশা আমাকে দিয়েছেন সেই নেশায় আমি আজও বেরিয়ে পড়ি। ঘুরতে বেরিয়ে সেখানকার আবহাওয়ায় আমি বেশি ভালো থাকি। তবে কি করি, আমাকে আবার ফিরে আসতে হয় বাচ্ছাদের জন্যে, আবৃত্তির জন্যে। এইগুলোই তো আমার বেঁচে থাকার রসদ। তবে এখানে এসে যখন আবৃত্তি করি তখন

প্রকৃতির সেই ভাবকে আমি কবিতার সাথে মেলাতে চেষ্টা করি। আসলে এনার্জি পাই বলাটা ঠিক হবে না। ঘুরতে গেলে আমার মধ্যে কবিতা বোঝার, বা আবৃত্তি করার একটা বোধ জেগে ওঠে। আমি চেষ্টা করি প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে নিজের ভালোলাগাটা তুলে ধরতে।

১৩. তুমি না তোমার বর কে বেশি উৎসাহিত থাকো ঘুরতে যাওয়ার বিষয়?

আমরা দুজনেই একে অপরের পরিপূরক। আমরা দুজনেই ঘুরতে খুবই ভালবাসি। সে কিছু না বললে আমি ঘুরতে যাওয়ার কথা বলি, আর আমি কিছু না বললে সে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে। আসলে আমরা ভ্রমনম্মাদ।

১৪. এখনও অবধি কোথায় কোথায় ঘুরতে গেছো?

ছোট থেকে যেহেতু বহু জায়গায় ঘুরেছি তাই এখনও অবধি অনেক জায়গায় আমার ঘোরা হয়ে গেছে। সব থেকে কাছে দিঘা প্রায় পনেরো থেকে বিশ বার ঘুরে ফেলেছি। এরপর দার্জিলিং, হরিদ্বার, মুসৌরি, নৈনিতাল, তারপর রাজস্থান, ওড়িশার সুন্দরগড়, কেওনঝর, উত্তরে জম্মু কাশমিট, সিমলা, কুলু, মানালি, উত্তরাখণ্ড এর বিভিন্ন জায়গা। দক্ষিণ ভারতের প্রায় পুরোটাই ঘুরে ফেলেছি। এছাড়া উত্তর পূর্ব ভারতের আসাম এবং অরুণাচল ঘুরে এসেছি। এবার ইচ্ছা রয়েছে মেঘালয় যাবার। এছাড়াও গাড়ি নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছি কার্শিয়াং, ভাইজ্যক, বেনারস, পুরী তো প্রায় পাঁচ ছ'বার। এছাড়া করোনা সময় ডুয়ার্স গেছি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি। লাভা লয়েগাও তো জলভাত হয়ে গেছে।

১৫, এতটা সময় যে এই সব কিছুতে দাও এতে তোমাদের নিজেদের জন্য সময় খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয় না?

না আমরা ঠিক নিজেদের জন্য সময় বার করে নিতে পারি। এটাই আমাদের মধ্যে অ্যাডজাস্টমেন্ট। আমি যখন আবৃত্তি করি তখন ও হয়তো নিজের কিছু কাজ করে নিলো। তারপর আমরা সব কিছু শেষ করে নিজেদের জন্য সময় বের করি।

১৬, তোমার প্রিয় কবিদের নাম শুনি, আর তোমার প্রিয় আবৃতিশিল্পীর নাম।

কবি বলতেই প্রথমেই রয়েছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপর বুদ্ধদেব বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, তসলিমা নাসরিন। এছাড়া এখনকার কবিদের মধ্যে অদিতি বসু রায়, রানা চ্যাটার্জী, চন্দন নাথ, অনির্বাণ ঘোষ। ছড়াকার আশীষ কুমার মুখোপাধ্যায়। তারাপদ রায়, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় , মন্দাক্রান্তা সেন, দেবেশ ঠাকুর, রামচন্দ্র পাল।

আমার আবৃত্তি শিখায়াতন ' শঙ্খমালার' কর্ণধার এবং আমার গুরু স্যার শ্রী সুমন্ত্র সেনগুপ্ত মহাশয় এবং বাক নামক একটি সংস্থার কর্ণধার শ্রীমতি রত্না মিত্র। এছাড়া শিশিক্ষু সংস্থার কর্ণধার বিজয়লক্ষী বর্মন। এনারা আমার খুব প্রিয় আবৃত্তি শিল্পী।

১৭, এমন কেউ আছেন যার সাথে তুমি একসাথে বাচিক শিল্পী হিসেবে কাজ করতে চাও?

বাচিক শিল্পী হিসেবে আমি অনেকের সাথে কাজ করেছি ইতিমধ্যেই। যেমন অমিতাভ নাথ, অমিত চক্রবর্তী দার কবিতায় কাজ করেছি। তবে এখন ইচ্ছা থাকলও সময়ের অভাবে কাজ

করে ওঠা হয় না। অনেক ভালো শিল্পীরা রয়েছেন ইচ্ছা রইল সকলের সাথে কাজ করার।

১৮.জীবনে খুশি থাকার মন্ত্র কি তোমার কাছে?

তোমার যেটুকু আছে সেই নিয়ে খুশি থাকো। আর যা তুমি ভালোবাসো সেটা করো। যেমন আমার এখন ১০৩ জ্বর অথচ আমি কবিতা আবৃত্তি করছি। এতে আমার মন ভালো হয়ে যাচ্ছে। আমার মধ্যে একটা পজিটিভ ভাইভ তৈরি হচ্ছে। আসলে তুমি যেটা করতে ভালো বাসবে সেটা তোমার মধ্যে একটা পজিটিভ চিন্তার সঞ্চার করবেই।

১৯.সব শেষে জিজ্ঞাসা করব গত বছরের নবোদয় পত্রিকা কি তুমি পড়েছিলে? তোমার কেমন লেগেছে?

হ্যাঁ গতবছরের পত্রিকা আমি পড়েছিলাম আমার বেশ ভালো লেগেছিল। সকলের লেখাই অনবদ্য ছিল। আমি এই পত্রিকার শ্রী বৃদ্ধি প্রার্থনা করি। এই কনিষ্ঠ পরিবারের প্রত্যেকে ভালো থাকুক। এই পত্রিকা আরো উন্নতি করুক।



এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধার বিজয়গাঁথা



কলমে - মুক্তিযোদ্ধা দেবেশ সান্যাল

আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। আমার নাম দেবেশ চন্দ্র সান্যাল। ১৯৭১ সালের ২৬মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। আমি দেশের ক্রান্তিকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনের আহ্বানের কথা শুনে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র নিয়ে পকিস্তানি সৈন্য ও তাদের এদেশিয় দোসরদের বিরুদ্ধে গেরিলা সম্মুখ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশে যাত্রা করার দিনটি ছিল ২৩ জুলাই'৭১ (৬ শ্রাবণ ১৩৭৮) শুক্রবার। রাত ৯ টায় আমি শাহজাদপুরের তদানীন্তন এম.পি.এ জনাব মো: আব্দুর রহমান স্যারের সাথে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ভারতের উদ্দেশে রওনা হলাম। আমরা এক সাথে ২২ জন রওনা হয়েছিলাম। পাকিস্তানি হানাদারেরা ২৫শে মার্চ'৭১ রাত সাড়ে ১১ টার পর "অপারেশন সার্চলাইট" পরিকল্পনা করে জঘন্নতম জ্বালাও,পোড়াও ও হত্যা সহ বিভিন্ন মানবতা বিরোধী কাজ শুরু করেছিল। এই "অপারেশন সার্চলাইট" টি ছিল তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অনুমোদন ও আদেশ ক্রমে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল টিক্কা খানের সার্বিক তত্ত্বধানে এবং মেজর রাও ফারমান আলীর নেতৃত্বে। ২৫ মার্চ কালরাতের পর সারাদেশের অধিকাংশ স্থান পাকিস্তানি হানাদারদের দখলে চলে যেতে থাকলো। পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ভাষণের পর ১৯৭০-এর নির্বাচনে পরাজিত আমাদের দেশের জামায়াতে ইসলামী সহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল তাদের সহযোগী হয়ে গেল। তাদের নেতৃত্বে সারা দেশে পাকিস্তানি সৈন্যদের সহযোগিতা করার জন্য পিচ কমিটি, রাজাকার,আল-বদর, আল-শামস ও অন্যান্য বাহিনী গড়ে উঠলো। সারাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যরা জ্বালাও,পোড়াও, লুটতরাজ, হত্যা, গণহত্যা নারী নির্যাতন, ধর্ষণ সহ বিভিন্ন মানবতা বিরোধী কাজ করে চলেছে।পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রধান টার্গেট ছিল এদেশের হিন্দু ও চিহ্নিত আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা

পাকিস্তানি সৈনিক ৯ মে’৭১ রবীন্দ্র কাছারী বাড়ির কাঠের পুল কাছে একজন হিন্দু মেয়েকে নির্যাতন করে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করলো। পাকিস্তানি হানাদারেরা এদেশের হিন্দুদের খুঁজে বের করার জন্য মানুষকে জিজ্ঞেস করতো- “মালাউন কাহা হ্যায়”। পুরুষ কাউকে ধরলে বলতো-“তুম মুসলিম হ্যায় ? চার কলেমা বাতাও"। উলঙ্গ করে হিন্দু মুসলমান পরীক্ষা করতো। পাকিস্তানি সৈন্যদের সহযোগিতা করছে এদেশের বিভিন্ন স্বাধীনতা বিরোধীরা। আমি মুক্তিযুদ্ধে গেলে নিশ্চিত মারা যাব। এই ভেবে বাবা-মা কিছুতেই মুক্তিযুদ্ধে যেতে সম্মতি দিতেন না। তাই বাবা-মা ও পরিবারের অন্য কাউকে না জানিয়ে ভারতের উদ্দেশে রওনা হলাম। রওনা হওয়ার আগে আমার লেখাপড়ার খাতার একটি পাতা ছিড়ে মাকে একটা চিরকুট লিখলাম।

“ মা, প্রনাম নিও, বাবাকে আমার প্রনাম দিও। বড় দাদা, মেজদাদা, ও বৌদিকে প্রনাম দিও। ছোট ভাই বোনকে ¯আশিষ দিও। আমি মুক্তিযুদ্ধে গেলাম। তোমাদেরকে বলে গেলে যেতে দিতে না তাই না বলে চলে গেলাম। অপরাধ ক্ষমা করিও। আশীর্বাদ করিও। আমি যেন বিজয়ী হয়ে তোমাদের কাছে ফিরে আসতে পারি।
ইতি- তোমার ছেলে দেবেশ।”

মুক্তিযুদ্ধে যাবার সময়ে বাড়ির কাউকে জানিয়ে যাইনি। মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে বাড়িতে এসে জানতে পারলাম আমার কারণে আমার বড় দাদা ও ছোট ভাইকে নৌকা ডুবিতে পড়তে হয়েছিল। আমি ভারতের উদ্দ্যেশে রওনা হওয়ার আধা ঘন্টার পরই মাতৃদেবী আমাকে খেতে ডেকে ছিলেন। আমাকে না পেয়ে খোঁজাখুজি করে জানতে পেরেছিলেন পালেদের বিলের ঘাট থেকে এক নৌকা মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিয়ে জন্য ভারতে রওয়া হয়েছে। মাতৃদেবী আমার জন্য কান্নাকাটি শুরু করেছিলেন। তখন আমার বড় দাদা ও ছোটভাই গ্রামের জালাল কাকা সহ কয়েকজনকে একটা নৌকা নিয়ে আমাকে ফিরিয়ে আনাতে শাহজাদপুরে

করায় আমি বললাম “জয় বাংলা”।ওনারা বুঝতে পারলেন আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমাকে জরিমানা না করে ছেড়ে দিলেন। পরবর্তী ট্রেনে উঠে ওল্ড মালদহ স্টেশনে নামলাম। কয়েকদিন ওল্ড মালদহ, গাজল, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে আত্মীয় বাড়ি ঘুরলাম। আমার পিসেমহাশয়ের ভগ্নিপতি ছিলেন একটি শরণার্থী ক্যাম্পের ইনচার্জ। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন-“ তুমি ছোট মানুষ তোমার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে শরণার্থী ক্যাম্পে ভর্তি করে নিচ্ছি। তুমি রেশন ও অন্যান্য সকল সুবিধা পাবে। আমি বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনের জন্য ভারত এসে শরণার্থী শিবিরে বসে বসে খাবো? তাই প্রস্তাবে রাজি হলাম না। কয়েক দিন ভারতের বিভিন্ন আত্মীয় বাড়িতে ঘুরে আবার ফিরে এলাম কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে। আমাদের শাহজাদপুরের রবীন্দ্র নাথ বাগচী ও রতন কুমার দাস সহ কয়েকজনকে পেলাম। তাঁরা আমাকে পরামর্শ দিলেন তুমি মালঞ্চ (কুরমাইল) ক্যাম্পের ইনচার্জ ৭ নং সেক্টরের উপদেষ্টা বেড়া সাঁথিয়ার এম.এন. এ অধ্যাপক আবু সাইয়িদ স্যারের কাছে যাও। আমি তাঁদের পরামর্শে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ স্যার এর কাছে গেলাম। আমার পরিচয় দিয়ে আমাকে মুক্তিযুদ্ধে ভর্তি করার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি আমাকে কামাপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠালেন। আমাকে ভর্তি করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলাম। কর্তৃপক্ষ আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমার দেশপ্রেম, সাহসী মনোভাব ও অন্যান্য শুনে ভর্তি করলেন। প্রাথমিক ট্রেনিং ক্যাম্পে আমাদের ফলইং করিয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়ানো হতো। আর পিটি প্যারেড করানো হতো। কদিন কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে থাকার পর আমাকে, রবীন্দ্রনাথ বাগচী, রতন কুমার দাস ও মো: নজরুল ইসলামকে ট্রান্সফার করলো মালঞ্চ ট্রানজিট ক্যাম্পে, তারপর মালঞ্চ থেকে কুড়মাইল ট্রানজিট ক্যাম্পে। কুড়মাইল থেকে আমাদেরকে আনা হলো পতিরাম ক্যাম্পে। পতিরাম ক্যাম্প থেকে এক হায়ার ট্রেনিং এর জন্য এক যোগে ভারতীয় আর্মি লরিতে ২০/২২ জনকে ।

নিয়ে আসা হলো দাজিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার পানিঘাটা নামক ইন্ডিয়ান আর্মি ট্রেনিং ক্যাম্পে। প্রশিক্ষন শুরুর দিনে কো-অর্ডিনেটর প্রথমে ফলোয়িং করিয়ে প্রশিক্ষনের বিভিন্ন নিয়ম কানুন বিষয়ে বললেন। স্থানীয় পরিবেশ সম্পর্কে বলেলন। তিনি বললেন- এই বনাঞ্চল এলাকাটি তেমন ভালো না, পোকা মাকড় আছে, হিংস্র প্রাণী আছে, ও বনমানুষ আছে। কিছু নকশাল আছে যারা বালাদেশে স্বাধীনতার পক্ষে নয়, কিছু ফেরারী আসামি ও সাজাপ্রাপ্ত খারাপ লোক আত্মগোপন করে আছে। আপনারা কখনো একা বাইরে যাবেন না। তিনি বললেন দুপুর ১২-০০টায় প্রশিক্ষণ প্রধান ডি এস ভিলন স্যার আসবেন।

ঠিক দুপুর ১২-০০টায় প্রশিক্ষন প্রধান শিখ সেনা ডি এস ভিলন এলেন। তিনি আমাদের সকলকে উদ্দেশ্য করে হিন্দিতে যা বললেন, তার মোটামুটি অর্থ হলো-'... আপনাদেরকে স্যালুট। আপনারা বীর, আপনারা আপনাদের দেশমাতাকে হানাদার থেকে মুক্ত করতে যুদ্ধ করতে এসেছেন। আমরা আপনাদের জন্য তেমন কিছু করতে পারবো না। আমরা মানবিক সহায়তা,, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দেব। আপনাদের দেশকে আপনাদেরই স্বাধীন করতে হবে। আপনাদের জন্মদাতা পিতা মাতাকে স্যালুট জানাচ্ছি। তাঁরা দেশের জন্য তাঁদের সন্তানদেরকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছেন...।'

পানিঘাটা ট্রেনিং ক্যাম্পটি ছিল ভারতের শিলিগুড়ি মহকুমার ৭ নং সেক্টরের অধীন। পানিঘাটা স্থানটি ছিল চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা। কর্শিয়াং পাহাড় থেকে নেমে আসা একটি ক্যানেলের দক্ষিণ পাশের বনাঞ্চল। চাঁন মারি স্থানের বামপাশে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে ঝর্ণার জল। ক্যাম্পে নিয়ে এসে আমাদের তাবুর মধ্যে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। আমাদের প্রত্যেককে একটা মগ, একটা প্লেট, দুইটা প্যান্ট, দুইটা গেঞ্জি, একটি মশারি, ও বিছানা দেওয়া হলো। ট্রেনিং শুরু হলো। প্রসাব পায়খানা করা ছিল কষ্টকর। ট্রেনিং সময়ে চা পান করা যেত আমাদের ইচ্ছা মতে। চা

পাতি দিয়ে চা করে সসপেন ভর্তি করে নিয়ে ট্রেনিং স্থানে নামিয়ে দিতেন। আমাদের কাছে মগ থাকতো। যার যার ইচ্ছা মতো চা পান করা যেতো।

আমাদের ২১ দিনের ট্রেনিং হলো। আমাদেরকে থ্রিনট থ্রি রাইফেল, এল, এম,জি, এস,এল,আর, ষ্টেনগান, টুইঞ্চ মর্টার, হ্যান্ড গ্রেনেড চার্জ, এক্সপ্লোসিভের ব্যবহার, ফাষ্ট এইড সহ অন্যান্য ট্রেনিং দিল। যুদ্ধে সহযোদ্ধা আহত হলে বা শহীদ হলে করণীয় সর্ম্পকে এবং ফাষ্ট এইড সম্পর্কে ধারণা দিল। ভারতীয় কয়েকজন হিন্দু ,বিহারী ও শিখ সৈন্য প্রশিক্ষণ দিল আমাদের কোম্পানীর। আমাদের কোম্পানীর নাম ছিল ডেল্টা কোম্পানী। প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন শিখ সেনা ডি.এস. ভিলন। বিদায়ের সময়ে তাঁর এর কাছ থেকে জানলাম আমার এফ.এফ নং-৪৭৪২। ট্রেনিং শেষে আমাকে, রবীন্দ্রনাথ বাগচী, মো: নজরুল ইসলাম ও রতন কুমার দাসসহ ৪০/৫০ জনকে নিয়ে আসা হলো ৭ নং সেক্টরের হেড কোয়ার্টারে। এটা ছিল পশ্চিমবঙ্গের কালিয়াগঞ্জ থানার তরঙ্গপুরে। তরঙ্গপুর এনে সিরাজগঞ্জ জেলার ১০ জনের সমন্বয়ে একটি গেরিলা গ্রুপ করা হলো। আমাদের গ্রুপের গ্রুপ লিডার নিযুক্ত হলেন বেলুকুচি উপজেলার তামাই গ্রামের এম.এ মান্নান। ডেপুটি লিডার নিযুক্ত হলেন শাহজাদপুর উপজেলার জামিরতা গ্রামের অধিবাসী বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগচী। আমাদের কে তরঙ্গপুর থেকে অস্ত্র, গোলা-বারুদ, রেশনিং ও পকেট মানি দেওয়া হলো। আমার নামে একটি থ্রি নট থ্রি রাইফেল, এক ম্যাগজিন গুলি, একটি হেলমেট ইস্যু করা হলো। অন্যান্য গোলা বারুদ,মাইন,গ্রেনেড ও এক্সপ্লোসিভ কমান্ডার স্যারের কাছে দিলেন।

মৃত্যু যে হবেনা এমন কোন গ্যারান্টি ছিল না। তাই আমি তরঙ্গপুর বাজার থেকে একখানা শ্রী শ্রী চন্ডী গ্রন্থ, একটি মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ও একটি চারব্যান্ডের রেডিও কিনলাম। তরঙ্গপুর থেকে কালিয়াগঞ্জ পর্যন্ত বাসে এসে ট্রেনে

উঠলাম। শিলিগুড়ি রেলওয়ে জংসন ষ্টেশনে এসে আমাদের ট্রেন বদলাতে হলো। ট্রেন বদলীয়ে আসামগামী ট্রেনে উঠলাম। আসাম গামী ট্রেনে ধুপরী নামক ষ্টেশনে আমরা নামলাম। তারপর বাসযোগে মানিকার চর এলাম। রাত হয়ে যাবার কারণে রাতে মানিকার চরে একটা বডিং-এ থাকলাম। পরদিন সকালে নদী পার হয়ে এলাম তদানীন্তন রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার (বর্তমানে জেলা) মুক্তাঞ্চলে স্থাপিত রৌমারী মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। রৌমারী ক্যাম্পে আমরা ¯স্নান খাওয়া করলাম। আমাদের কমান্ডার স্যার সিরাজগঞ্জ জেলার মুক্তাঞ্চল যমুনার চড়ে পৌঁছানোর জন্য একটি বড় ছইওয়ালা নৌকা ভাড়া করলেন। রৌমারী ক্যাম্প থেকে রাতের খাবার খেয়ে রাত ন'টার দিকে আমাদের নৌকা ছাড়লো। ইহা ছিল ৬ই সেপ্টেম্বর’৭১। নৌকায় বাহাদূরাবাদ ঘাট, জগন্নাথগঞ্জ ঘাট ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা দিয়ে আসতে হয় সেটা আমরা জানতে পেরেছিলাম। বাহাদূরাবাদ ঘাট অত্যন্ত ঝুঁকি পূর্ণ এলাকা। ঐ ক্যাম্পের পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারেরা ভয়ানক। তারা স্পীড বোট নিয়ে রাতে নদী টহল দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের নৌকা পেলে ধরে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে নিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। আমাদের কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান স্যার নির্দেশ দিলেন-”আপনারা সবাই নৌকার ডওরার মধ্যে পজিশন অবস্থায় থাকুন। পাকিস্তানি হানাদারেরা ধরতে এলে আমরা ধরা দেব না। যুদ্ধ করবো। যুদ্ধ করে শহীদ হবো কিন্তু ওদের হাতে ধরা দিব না”। রাত ২.০০ টার দিকে আমরা বাহাদূরাবাদ ঘাট এলাকা অতিক্রম করলাম। ওদের সার্চ লাইটের আলো এসে বার বার আমাদের নৌকাতে পড়ছিল। ভগবানের কৃপায়-ওরা আর স্পীড বোট নিয়ে ধরতে এলোনা। আমরা বাহাদূরাবাদ ঘাট এলাকা অতিক্রম করলাম। আমাদের সাথে চিড়া গুড় ছিল। ভোরে মাঝিরা এক কাইসা ক্ষেতের মধ্যে নৌকা ঢুকিয়ে দিল। আমরা নীচে নেমে ক্ষেতের মধ্যে প্রাত্যহিক কর্ম সেরে নিলাম। আমাদের সাথে থাকা চিড়া ও গুড় দিয়ে সকালের জলখাবার খেলাম। তার পর নৌকা আবার ছাড়লো। তখন কাজিপুর থানার অধিকাংশ এলাকা পাকিস্তানি

হানাদারদের দখলে। কাজিপুর থানার সামনে দিয়ে আমাদের নৌকা আসবে। দেখে শুনে খোঁজ নিয়ে থামিয়ে থামিয়ে ৪ দিন ধরে নৌকা এসে পৌছালো সিরাজগঞ্জ হানাদার মুক্তাঞ্চল যমুনার চরে।এটা ছিল টাঙ্গাইল জেলার সিংগুলির চড়ের নিকটবর্তী। নৌকাতেই রান্নার ব্যবস্থা ছিল। মাঝিরা কোন রকমে ডালভাত অথবা খিচুরী রান্না করে আমাদের খাওয়াতো। এই ভাবে খেয়ে -না খেয়ে চলছিলাম। পরদিন রাতে যমুনা নদীর এপাড়ে চলে বেলকুচি-কামারখন্দ নির্বাচনী এলাকার এম.এন.এ জনাব মো: আব্দুল মোমিন তালুকদারের গ্রামের বাড়িতে চলে এলাম। তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর ভাই মো: রশিদ তালুকদার আমাদের থাকা খাওয়া ও অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা করলেন। অক্টোবর’৭১ মাসের মাঝা মাঝির আগে পযর্ন্ত আমাদের দলের মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা কম থাকায় সম্মুখ যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত কমান্ডার স্যার নেননি। আমরা পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য ও তাদের দোসরদের আতঙ্কে রাখার জন্য গেরিলা কার্যক্রম হিট এন্ড রান চালাতাম। পাকিস্তানি সৈন্য বা রাজাকার ক্যাম্পের নিকটবর্তী গিয়ে ২/৪ টা থ্রি নট থ্রি রাইফেলের আকাশমুখী করে ফাঁকা গুলি ছুড়ে চলে আসতাম। পাকিস্তানি দালাল, পীচ কমিটির লোক ও অন্যান্যরা আমাদের অবস্থানের কথা জানতে পারতো। আমরা দিনের বেলা স্কুলে বা কারো বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকতাম।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে দেশের অভ্যন্তরে ছিল দুইটি পক্ষ। একটি স্বাধীনতার পক্ষে। অন্যটি স্বাধীনতার বিপক্ষে। স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল পীচ কমিটির সদস্য,রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও অন্যান্যরা। স্বাধীনতা বিরোধীরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ কারীদের তথ্য দিয়ে দিত পাকিস্তানি সৈন্যদের। তারা এসে বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ,চাঁদাবাজি করতো। বাড়ির মালিককে ধরে নিয়ে নির্যাতন ও হত্যা করতো। হিন্দু ও আওয়ামী লীগ নেতারা ছিল ওদের বড় টার্গেট। হিন্দু নারী পুরুষকে ধরে নিয়ে যেত। নির্যাতন, ধর্ষণ , হত্যা করতো ও জোর

করে ধর্মান্তরিত করাতো। বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধারাও পাকিস্তানি হানাদার পক্ষ ত্যাগ ও তাদের সহযোগিতা করার জন্য বিশেষ ভাবে অত্যাচারী পাকিস্তানি দালাল ও রাজাকারদের হত্যা করতো।

অধিকাংশ গ্রুপের সিদ্ধান্ত ছিল কোন অত্যাচারি ও নারী ধর্ষণকারি পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য ধরতে পারলে ফায়ারিং স্কোয়ার্ডে দেওয়া হবে। অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপে একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধাকে জল্লাদ হিসাবে মনোনয়ন করা হতো। আমাদের গ্রুপের জল্লাদ ছিল দৌলতপুর গ্রামের মুক্তি মো: শামসুল হক। আমরা কোন পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য ধরতে পারি নি বা কাউকে মারি নি। আমাদের গ্রুপের নীতি ছিল- “আমরা আমাদের দেশী কোনো ভাইকে হত্যা করব না। বরং বুঝিয়ে তাদেরকে স্বাধীনতার পক্ষে আনাব। আমরা নিজেরা বা তাদের আত্মীয়ের মাধ্যমে বুঝিয়ে বিভিন্নভাবে স্বাধীনতা বিরোধীদের স্বাধীনতার পক্ষে আনার চেষ্টা করতাম। আমাদের হাতে অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রতিটি মুহূর্তে আতঙ্কে থাকতাম। যে কোন সময় পাকিস্তানি হানাদাররা আমাদের আক্রমণ করতে পারে। আমাদের থাকা খাওয়ার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। আমরা আজ এ শেল্টারে কাল সে শেল্টারে থাকতাম। আমরা কোন শেল্টারেই একাধিক দিন থাকতাম না। কোন কোন দিন শেল্টারের অভাবে সারারাত চিড়া গুড় খেয়ে রাত্রি জেগে স্কুলের বেঞ্চে শুয়ে থাকতে হতো। কি যে অমানবীয় কষ্ট! আমাদের শেল্টারে পালাক্রমে আমরা দু’জন করে করে পাহাড়া দিতাম। প্রতি রাতে কমান্ডার স্যার আমাদের পাশওয়ার্ড দিতেন। আমরা রাতে বিভিন্ন রাজাকারদের বাড়িতে গিয়ে তাদের বুঝাতাম। সকালে আমরা অস্ত্র পরিস্কার করতাম ও অস্ত্রে তেল দিতাম।

তখন দেশের অধিকাংশ মানুষ ছিল স্বাধীনতার পক্ষে। তবুও স্বাধীনতা বিরোধীদের ভয়ে অনেকে আমাদের শেল্টার বা খাবার দিতে সাহস পেতেন না। কারণ অধিকাংশ গ্রামেই ছিল পাকিস্তানি

দালাল ও রাজাকার। তারা খোঁজ পেলে পার্শ্ববর্তী আর্মি বা রাজাকার ক্যাম্পে সংবাদ দিয়ে তাদেরকে নিয়ে এসে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবে, বাড়ির মালিককে ধরে নিয়ে হত্যা করবে ও অত্যাচার চালাবে এই ছিল তাদের ভয়। আমাদের সাথে সব সময় চিড়া গুড় থাকতো।

স্থানীয় কিছু আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ট্রেনিং দেওয়ায়ে আমাদের সাথে নিলাম। আমি মুক্তিযুদ্ধে যাবার কারণে আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। রাজাকারদের আলটিমেটামে গণহত্যার হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গোটা পরিবার বাড়িঘর সবফেলে ভীষণ ঝুঁকি নিয়ে ভারতের আসামের মানিকার চড় শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। “জয় বাংলা” ছিল আমাদের রণাঙ্গনের প্রধান ধ্বনি। আমি যুদ্ধ শুরুর পূর্ব ভগবান এর নাম নেওয়ার পরই “জয় বাংলা ধ্বনি দিয়ে যুদ্ধ শুরু করতাম। যুদ্ধ চলাকালিন সময়েও আমরা মাঝে মধ্যে “জয় বাংলা" ধ্বনি দিতাম। এই রণ ধ্বনি আমাদের সাহস বাড়িয়ে দিত।

কোথাও আক্রমণের পূর্বে আমরা রেকী করে দেখতাম। তারপর আক্রমন করতাম। আমি আমার রণাঙ্গণের সাথীদের বলে রেখে ছিলাম-“ আমি রণাঙ্গণে মারা গেলে, তরঙ্গপুর বাজার থেকে কেনা জাতীয় পতাকা দিয়ে মুড়িয়ে আমার দেহ নদীতে দিয়ে দেবেন”। মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনে আমি মারা গেলে তখন বাংলাদেশে লাশ নিয়ে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করার কোন লোক ছিল না। আমাদের গ্রুপের গেরিলা/সম্মুখ যুদ্ধগুলো হলো :

১। বেলকুচি থানা আক্রমণ
২। কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে ট্রেন আক্রমণ
৩।কল্যাণপুর যুদ্ধ
৪।ধীতপুর যুদ্ধ

১। বেলকুচি থানা আক্রমণ যুদ্ধ:

বেলকুচি সিরাজগঞ্জ জেলার একটি উল্লেখযোগ্য থানা। অক্টোবর'৭১ মাসের শেষের দিকে আমরা এই থানা আক্রমণ করেছিলাম।এই যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান স্যার। কমান্ডার স্যার ও আরো তিনজন রেকিতে একযোগে বেলকুচি থানা ও মুসলিমলীগ নেতা মোঃ আব্দুল মতিনের বাড়ি আক্রমণ করলাম। সন্ধ্যায় বানিয়া গাতি গ্রামের এক বাড়ির শেল্টারে কমান্ডার স্যার বিস্তারিত ব্রিফ করলেন। উনি আমাদের দুই দলে ভাগ করে দিলেন। সিদ্ধান্ত হলো কমান্ডার স্যারের নেতৃত্বে বড় দলটি থানা আক্রমণ করবে। অন্য দলটি রবীন্দ্রনাথ বাগ্চীর নেতৃত্বে মতিন সাহেবের বাড়ি আক্রমণ করে মতিন সাহেবকে ধরে আনবে। আমি কমান্ডার স্যারের গ্রুপে থেকে থানা আক্রমণ যুদ্ধে অংশ নিলাম। রাত ৯ টায় বানিয়া গাতি থেকে যাত্রা শুরু করলাম। থানার কাছে গিয়ে দুটি গ্রুপ টার্গেটের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। নিদিষ্ট সময়ে রাত ১২টায় একযোগে আক্রমনের সিদ্ধান্ত হলো। পরিকল্পনা মোতাবেক থানার পশ্চিম পাশ দিয়ে স্ক্রোলিং করে থানার সামনে যেতেই সেন্ট্রি দেখে ফেললো। হুইসেল বাজিয়ে থানার সবাইকে জানিয়ে দিয়ে আমাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করলো। আমাদের কমান্ডার স্যার কমান্ড করে ফায়ার ওপেন করলেন। আমরা সবাই একযোগে গুলি করলাম। এক ঘণ্টা ব্যাপি যুদ্ধ চললো। ভয়াবহ যুদ্ধ। আমার মাথায় হেল মেট। দুইটি গুলি এসে হেলমেটে লাগলো। আমার ডান পাশে আমার কমান্ডার। হয় বিজয় আর না হয় মৃত্যু, এ ছাড়া কোন পথ নাই। বৃষ্টির মত গুলি চালিয়ে যাচ্ছি। যুদ্ধ চলাকালীন এক সময়ে কমান্ডার স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন- "দেবেশ মাথা তুলো না, গুলি চালিয়ে যাও"। আমাদের বৃষ্টির মতো গুলিতে থানার বিহারী পুলিশ ও রাজাকার থানার পিছনদিক দিয়ে পালিয়ে সোহাগপুর নদীতে থাকা একটি লঞ্চে চড়ে রেঞ্জের বাইরে যমুনার মধ্যে চলে গেল। ওরা চলে যেতেই থানার সেন্ট্রি গুলি করা বন্ধ করে দুই হাত উপরে তুলে আত্মসমর্পণ করলো।

কালিয়া হরিপুর রেলওয়্রে ষ্টেশনে ট্রেন আক্রমণ:

পাকিস্তানি সৈন্য ও ব্রীজ পাহাড়ারত রাজাকারদের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য আমরা কালিয়া হরিপুর সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ থানার একটি রেলওয়ে স্টেশনে এলাম। এই অতর্কিত আক্রমণের নেতৃত্বে ছিলেন কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান স্যার। ৪ নভেম্বর'৭১ আমাদের গ্রুপের ঝাউল গ্রামের সিরাজগঞ্জের এম,এন, এ জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন তালুকদারের ভাই আওয়ামীলীগ নেতা জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ তালুকদারের রেকির ভিত্তিতে কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে পাকিস্তানি সৈন্য ও ব্রীজ পাহাড়ারত রাজাকারদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ করা জন্য প্রস্তুত করেছিলাম। কালিয়া হরেপুর যুদ্ধে যাওয়ার সময় আমার রণাঙ্গনের সাথী জনাব মো: আব্দুল হামিদ তালুকদার সাহেব আমাকে বললেন-" দেবেশ, মানিকাচর তোমার বাবা-মা সহ পরিবারের সবার সাথে দেখা করেছি। সবাই ভালো আছেন। তোমার রেশন ও পকেট মানির টাকা তোমার আব্বার হাতে দিয়ে এসেছি। তোমার এক ভাই আমার সাথে এসেছে তাকে শমেসপুর গ্রামে এক বাড়িতে রেখে এসেছি আগামী কাল সে তোমার কাছে আসবে।" ঐ যুদ্ধ হয় নাই। কমান্ডার স্যার ক্রোলিং করে রেল লাইনে বৈদ্যুতিক মাইন বসিয়ে এসেছিলেন। তথ্য ছিল ঈশ্বরদী থেকে পাক হানাদার নিয়ে একটি ট্রেন সিরাজগঞ্জ যাবে। কমান্ডার স্যার ট্রেনটি উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন। আমরা ধানক্ষেতের মধ্যে পজিশন অবস্থায় থাকলাম। কামান্ডার স্যারের হাতে মাইনের তার ও ব্যাটারী। টর্চ লাইট ও হ্যারিকেন হাতে পাকি মিলি শিয়া ও রাজাকারেরা ষ্টেশনে টহল দিচ্ছিল। ওদের পায়ে লেগে হঠাৎ আমাদের মাইনের তার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মাইনটি ওদের নজরে পড়লো। হুইসেল দিয়ে রাজাকারদের লাইং পজিশনে রেডি থাকতে বললো। আমাদের দিকে টর্চ লাইট মেরে মেরে খুজতে থাকলো আর উর্দূতে কথা বলতে থাকলো। ইতিমধ্যে ঈশ্বরদী থেকে সিরাজগঞ্জগামী পাকি হানাদারবাহী ট্রেন এলো। পাক হানাদারেরা সিগন্যাল দিল।

ষ্টেশনে ট্রেনটি থামিয়ে দিল। ট্রেনের পাক হানাদারেরা অস্ত্র তাক করা অবস্থায় নেমে আমাদেরকে খুঁজতে থাকলো। মাইনের বৈদ্যুতিক তার বিছিন্ন হয়ে পরায় আমাদের মাইনটি ব্লাস্টকরা সম্ভব হলো না। পাক হানাদারদের সংখ্যাধিক্যতা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে কমান্ডার স্যার উইথড্র হওয়ার কমান্ড করলেন। আমরা উইথড্র হয়ে কমান্ডার স্যারের বাড়ি বেলকুচি থানার তামাই গ্রামে এলাম। পরের দিন সিরাজগঞ্জ থেকে পাকি হানাদার ও রাজাকারেরা এসে কালিয়া হরিপুর ও পার্শ্ববতী গ্রামের কয়েকটি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল। কিছু লোকের উপর নিযার্তন চালিয়েছিল। আমরা কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে ষ্টেশন আক্রমণ থেকে ফিরে এসে তামাই গ্রামে কমান্ডার স্যারের বাড়িতে একত্রিত হই। কমান্ডার স্যারের মা আমাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমরা কমান্ডার স্যারের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের সবাইকে বসিয়ে কমান্ডার স্যার ব্রিফ করলেন। স্থানীয় ভাবে ট্রেনিং দেওয়া বেশ কিছু যুবককে আমাদের গ্রু ভর্তি করা হয়েছিল। এত বড় প্লাটুন এক শেল্টারে শেল্টার নেওয়া সমস্যা। তাই কমান্ডার স্যার ডেপুটি কমান্ডার রবীন্দ্রনাথ বাগ্চী কে কমান্ডার করে আমাদের ১১ জনের আর একটি গ্রূপ করে দিলেন।

০৩। কল্যাণপুর যুদ্ধ:

কল্যাণপুর সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার একটি গ্রাম। ৫ই নভেম্বর’৭১ কল্যাণপুর গ্রামে একটি যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন ডেপুটি কমান্ডার (কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত) রবীন্দ্রনাথ বাগ্চী। কমান্ডার স্যারের নির্দেশে আমরা ১১ জন রবীন্দ্রনাথ বাগ্চীর কমান্ডনাধীন হয়ে হেঁটে ভোরে বেলকুচি উপজেলার কল্যাণপুর নামক গ্রামে এক বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। বাড়ির মালিক আমাদের সকালের খাবারের ব্যবস্থা করলেন। আমরা সারারাত হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সকালের খাবার

ব্যবস্থা করলেন। আমরা সারারাত হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সকালের খাবার খেয়ে প্রকাশ্যে পিটি, প্যারেড করলাম। অস্ত্র পরিষ্কার করলাম। অস্ত্রে ফুলথ্রু মারলাম। একজন করে করে পাহাড়া দিতে থাকলাম। অন্যান্যরা ঘুম বা বিশ্রামে থাকলাম। কল্যাণপুর একটি নিভৃত গ্রাম। আমাদের ধারনা ছিল এই গ্রামে পাক হানাদার ও রাজাকার আসবে না। বেলা ১০টার দিকে সেন্ট্রিরত সহযোদ্ধা রতনকুমার দাস দৌড়ে এসে জানালেন আমদেরকে ধরার জন্য বেলকুচি থানা থেকে কয়েকজন পাক হানাদার মিলেশিয়া ও রাজাকার আসছে। বওড়া গ্রামের মধ্য দিয়ে কল্যাণপুরের দিকে আসছে। দুইজন পাকিস্তানি দালাল গামছা দিয়ে মুখ বেঁধে নিয়ে হানাদার ও রাজাকারদের পথ চিনিয়ে নিয়ে আসছে। দূর থেকে অনুমিত হলো এই দলে পাঁচজন মিলেশিয়া ও চার জন রাজাকার আছে। আমাদের কমান্ডার যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমরা কল্যাণপুর গ্রামের রাস্তার ধারে বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে পজিশন নিলাম। বাঁশ ঝাড়ের সামনের রাস্তা ধরে পাকিস্তানি হানাদার ও রাজাকারেরা আসছিল। আমাদের রেঞ্জের মধ্যে আসার সাথে সাথে আমাদের কমান্ডার রবীন্দ্রনাথ বাগ্চী কমান্ড ও ফায়ার ওপেন করলেন। আমরা এক যোগে গুলি করা শুরু করলাম। এক লাফে হানাদারেরা রাস্তার উত্তর পাশে পজিশন নিল। ওরাও আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চালালো। আমরাও একযোগে বৃষ্টির মতো গুলি করতে থাকলাম। গোলাগুলির শব্দ পেয়ে আশে পাশে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ আমাদেরকে সহযোগীতা করার জন্য এগিয়ে এলেন। এক ঘণ্টার অধিক সময় সম্মুখ যুদ্ধ চললো। তারপর পাক হানাদারেরা পিছিয়ে গেল। যুদ্ধে জয়ী হয়ে আমরা বিজয় উল্লাস করলাম। সকল স্তরের মানুষের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হলো। এক বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করলাম। তারপর হেঁটে দৌলতপুর গ্রামের সহযোদ্ধা মুক্তি মোঃ শামসুল হকের বাড়িতে শেল্টার নিলাম। ১৪ নভেম্বর’৭১ এই শেল্টারে আমার মেজো দাদা সমরেন্দ্রনাথ সান্যাল আমাদের সাথে যোগ দিলেন। কয়েক দিন দৌলতপুর, তেঞাশিয়া, খুকনী, বাজিয়ারপাড়া, দরগার চর ও অন্যান্য গ্রামে থাকতে থাকলাম।

০৪। ধীতপুর যুদ্ধ:

ধীতপুর সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার একটি গ্রাম। এই যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন ডেপুটি কমান্ডার (কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত) বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগ্চী। ডিসেম্বর'৭১ মাসের প্রথম সপ্তাহের পর আমরা শেল্টার নিলাম সৈয়দপুর গ্রামের কালা চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্যদের বাড়িতে। ১৪ ডিসেম্বর'৭১ সংবাদ পেলাম পাক হানাদারেরা কৈজুরী হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। টাঙ্গাইলের যুদ্ধে পাক হানাদারেরা পরাজিত হয়ে লঞ্চে যমুনা নদী পাড় হয়ে মালিপাড়া ক্যাম্পে এসেছে। মালিপাড়া ক্যাম্প থেকে রাস্তা চেনানোর জন্য দুইজন রাজাকারকে সঙ্গে নিয়েছে। আমরা পাক হানাদারদের আক্রমণ করার জন্য ওদের পিছু নিলাম। সংবাদ পেয়ে শাহজাদপুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপগুলোও আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে এলো। পাক হানাদারেরা ছিল ক্ষুধার্ত। কৈজুরী গ্রামের একজনের মুলো ক্ষেত থেকে মুলো খাওয়ার চেষ্টা করলো। ওরা হয়তো জানতো না কাঁচা মুলো খাওয়া যায় না। ওয়াপদা বাঁধ ধরে ওরা অগ্রসর হতে লাগলো। আমরাও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অস্ত্র তাক করে ওদের পিছু পিছু হাঁটতে থাকলাম। ওরা ভীষণ ক্রোধী। ধীতপুর নামক স্থানে গিয়ে ওরা আমাদের দিকে অস্ত্র তাক করলো। আমরা জাম্প করে ওয়াপদা বাঁধের পশ্চিম দিকে পজিশন নিলাম। ওদের উপরগুলি ছুঁড়তে শুরু করলাম। ওরা ওয়াপদা বাঁধের পূর্ব পাশে পজিশন নিল। এক ঘণ্টা ব্যাপী গুলি পাল্টা গুলি চলতে থাকলো। গুলির শব্দে বেড়া উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা দল আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে এলো। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। হানাদারেরা গুলি করা বন্ধ করলো। আমরাও অন্ধকারে গুলি করা বন্ধ করলাম। সারারাত আমরা না খেয়ে পজিশন অবস্থায় ছিলাম। আমাদের গ্রুপটি ছিল বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগচীর কমান্ডানাধীন। আমার বাম পাশে এল.এম.জি চালাচ্ছিলেন কমান্ডার রবীন্দ্রনাথ বাগচী স্যার। আমার ডান পাশে থ্রি নট থ্রি চালাচ্ছিলেন আমার মেজো

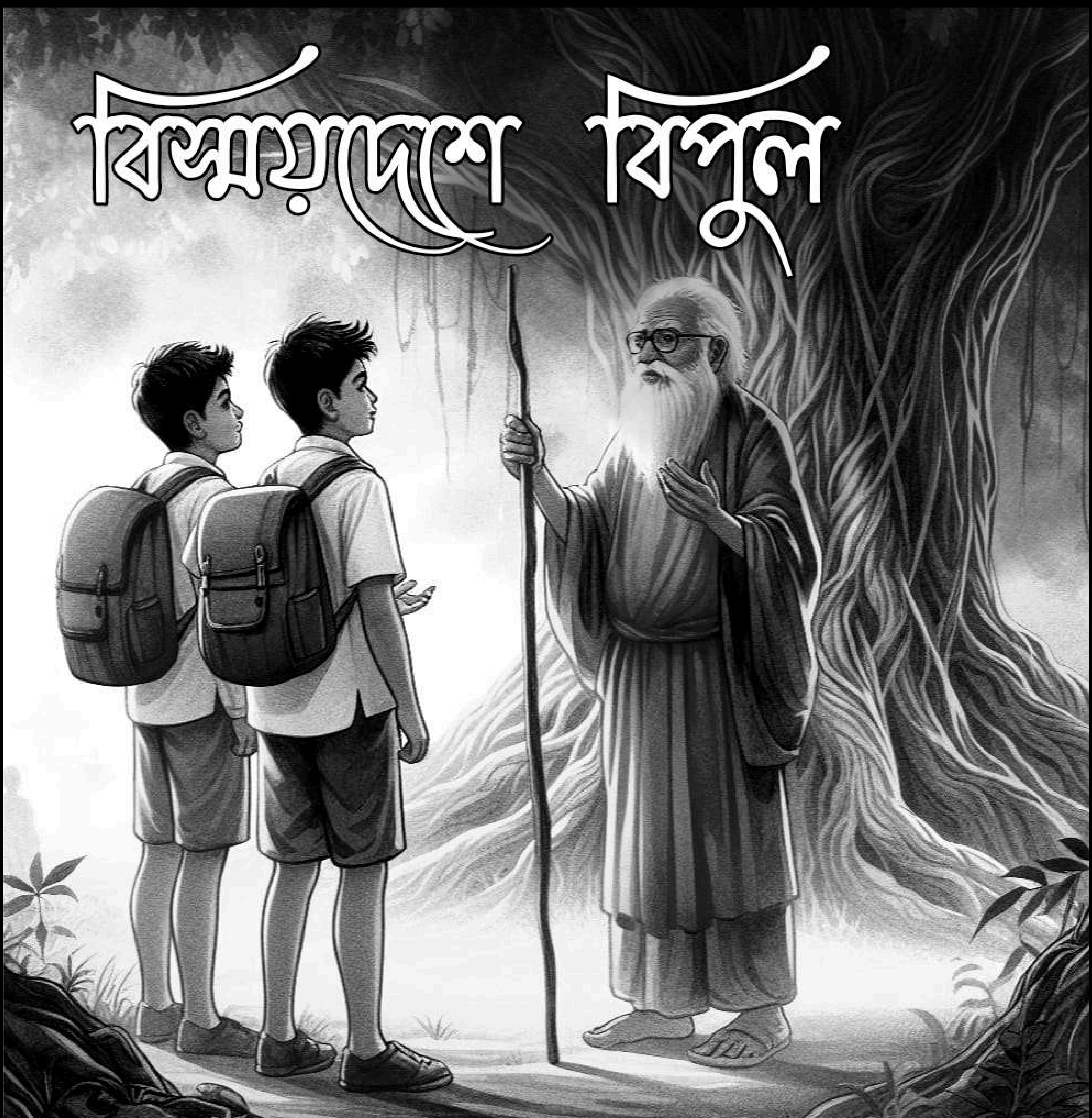
দাদা সমরেন্দ্রনাথ সান্যাল, তাঁর ডান পাশে আমার গ্রুপের অন্যান্যরা ষ্টেনগান ও থ্রি নট থ্রি রাইফেল চালাছিলেন। যুদ্ধটি ছিল ভীষন ভয়াবহ সম্মুখ যুদ্ধ। তথাকথিত হিংস্র পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। রাতে ধীতপুর সার গুদাম থেকে মাঝে মাঝে ২/১ টা করে গুলি আসছিল। ওদের গুলির প্রেক্ষিতে আমরা ২/১ টা করে গুলি করছিলাম। ভোর হলে আমাদের কমান্ডার বরীন্দ্রনাথ বাগ্চী ও বেড়ার কমান্ডার জনাব এস.এম আমির আলী ও অন্যান্যরা ক্রোলিং করে ধীতপুর সার গুদামে এগিয়ে গেলেন। সার গুদামে গিয়ে দেখা গেল দুজন রাজাকার সারারাত কভারিং ফায়ার করেছে। কমান্ড করে রাজাকার দুজনকে স্যারেন্ডার করালেন। রাজাকার দুজনের নাম ছিল লতিফ ও কালাম। তারা দুই জন আত্মসমর্পণ করলো। তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে নেওয়া হলো। তাদের কাছ থেকে জানা গেল রাত ১১ টার দিকে হানাদারেরা ক্রোলিং করে নিরাপদ দুরত্বে এসে হেঁটে বেড়া নদী পার হয়ে ভেড়াকোলা গ্রামের হলদারদের নৌকায় নদী পাড় হয়ে নগরবাড়ি ঘাট হয়ে ঢাকা যাবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। পাক হানাদারেরা বেড়া ঘাটে গিয়ে ধীতপুরের যুদ্ধে বেড়ার এস. এম.আমির আলীর গ্রুপের বৃশালিকা গ্রামের জনাব মোঃ আব্দুল খালেক ও ছেচানিয়া গ্রামের আমজাদ হোসেন শহীদ হয়েছেন এবং অন্যান্য গ্রুপের চারজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়েছেন। স্থানীয় দুজন পথচারী গোলাগুলির সময়ে গুলি লেগে ওয়াপদা বাঁধের উপর মারা গিয়েছেন। ধীতপুর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আমরা জামিরতা হাই স্কুলে ক্যাম্প করে অবস্থান নিয়েছিলাম। ১৪ ডিসেম্বর’৭১ শাহজাদপুর থানা হানাদার মুক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধা প্রশাসন গড়ে উঠে। মো: আব্দুল বাকি মির্জা শাহজাদপুর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাধিনায়ক ও থানা প্রশাসক মনোনীত হন। তিনি সিও (ডেভ) অফিসে বসতেন। শাহজাদপুর থেকে সারা উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের সমস্ত খরচ বহন করতেন।

১৯ ডিসেম্বর ব্যর্থ প্রেসিডেন্ট ও সেনা বাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খান

এম.পি.এ সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ওখানে আমাকে না পেয়ে ফিরে আসার সময় আমাদের করতোয়া নদীতে নৌকাটি ডুবে যায়। আমার ভাই ছোট হওয়ায় সবাই তাকে ধরে বাঁচাতে যায়। তখন আমার ভাই বলে - আমি সাঁতার জানি, আমার বড় দাদা সাঁতার জানেনা। আমার বড় দাদাকে বাঁচান। সবাই নৌকাটি উল্টিয়ে আমার বড় দাদা ও ছোট ভাইকে বাঁচিয়ে ছিল। আমরা সুজানগর সাত বাড়িয়া হয়ে পদ্মা নদী পাড় হয়ে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার চিলমারি ইউনিয়নের খারিজাথাক গ্রাম দিয়ে বাংলাদেশের বর্ডার অতিক্রম করলাম। আমরা ভারতের পশ্চিম বাংলার জলঙ্গী বর্ডার দিয়ে ভারতে ঢুকলাম। এম.পি.এ স্যার আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষনের ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের উদ্দেশে কোলকাতা যাওয়ার জন্য আমাদের সাথে মালদহ বাজার পর্যন্ত গেলেন। মালদহ বাজার থেকে মুড়ি এবং কাঁঠাল কিনে আমাদের সবাইকে খাওয়ালেন। তারপর তিনি কোলকাতা চলে গেলেন। আমরা রাত ৯ টার দিকে কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে গিয়ে পৌছালাম। তাঁরা আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পরদিন সকালে আমাদের সবাইকে ফলোইং করালেন। বয়সের স্বল্পতার কারণে ট্রেনিং কর্তৃপক্ষ আমাকে ভর্তি করলেন না। নিরুপায় হয়ে আমি আমার ওল্ড মালদহের পিশে মহাশয় বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। তখন ভারতের ট্রেন ও বাসে শরণার্থীদের কোন ভাড়া লাগতো না। বাস ও ট্রেনে ভাড়া চাইতে এলে “ জয় বাংলা” বললে বুঝতে পারতেন আমরা বাংলাদেশের শরণার্থী। ভারতের সাধারণ মানুষজন আমাদেরকে জয় বাংলা লোক বলতো। কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্প থেকে একটি বাসে করে কাছের একটি রেল স্টেশনে গেলাম। সেখান থেকে ট্রেন ধরলাম। বারসই রেলওয়ে জংশন স্টেশন থেকে ট্রেন বদলাতে হলো। আমি স্টেশনে বসে আছি। আমার কাছে ট্রেনের টিকেট নাই। মোবাইল কোর্টের লোক আমাকে ধরে নিয়ে গেল। একটি রুমে বসালো। ম্যাজিস্ট্রেট এক এক করে ডেকে ডেকে জরিমানা করলো। পর্যায়ক্রমে আমার পালা এলো। আমাকে নাম জিজ্ঞাসা

এর কাছ থেকে জোর করে ক্ষমতা কেড়ে নেয় জুল ফিকার আলী ভুট্টো। তিনি ৮ জানুয়ারী'৭২ আমাদের জাতির পিতাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেন। জাতির পিতা ঐ দিনই লাহোর থেকে সকালে বিমানে যাত্রা করে বিকালে অবরতরণ করেন ইংল্যান্ডের হিব্রো বিমান বন্দরে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আমাদের জাতির পিতাকে বিশেষ সম্মান দেখিয়ে সংবর্ধনা দেন। জাতির পিতা ১০ই জানুয়ারী ব্রিটিশের বিশেষ বিমান যোগে বাংলাদেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন। বাংলাদেশে আসার পথে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর আমন্ত্রনে ভারতে যাত্রা বিরতি করেন। তার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে আসলেন। ১২ই জানুয়ারী জাতির পিতা প্রথমে রাষ্ট্রপতি হিসেবে এবং পরক্ষণেই রাষ্ট্রপতি পদের ইস্তফা দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রথা চালু করে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। জাতির পিতা আমাদেরকে অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমাদের গ্রুপ ২৪ জানুয়ারী'৭২ রবিবার সিরাজগঞ্জ সদরস্থ ইব্রাহিম বিহারীর বাড়িতে অস্ত্র জমা নেওয়ার ক্যাম্পে অস্ত্র ও গোলা বারুদ জমা দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব শেষ করলাম। সরকারের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের পুণর্বাসন ও কর্মসংস্থানের জন্য ন্যাশনাল মিলেশিয়া ক্যাম্প করা হলো। আমি ন্যাশনাল মিলিশিয়া ক্যাম্পে ভর্তি না হয়ে বাড়িতে চলে এলাম। কয়েক দিন পর রতন কান্দি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমার বড় দাদা দেবেন্দ্রনাথ সান্যাল এর কাছ থেকে অষ্টম শ্রেণীর অটোপাশের টিসি নিয়ে শাহজাদপুর বহুপার্শিক উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে লেখা পড়া শুরু করলাম।

গল্প



কৃষ্ণ রায়

১

বিপুল বীরগঞ্জে থাকে। আশেপাশের পাড়ার লোকজনেরা তাঁকে 'বীরগঞ্জের বিপুল' নামেই চেনে। সে যেমন খেলাধুলোয় দক্ষ, তেমনি স্কুলে প্রতিবারই হয় প্রথম। আর কত মানুষের বিপদে সে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। তাই তাঁকে সকলে মিলে ওই খেতাব দিয়েছে। অবশ্য খেতাব পাওয়ার আশা নিয়ে বিপুল কখনই কিছু করেনি। তাঁর মধ্যেকার মানুষটি সবসময় তাঁকে সৎপথে চলার জন্য উৎসাহ যেমন দেয় তেমনি পীড়িত মানুষদের পাশে থাকতে নির্দেশ দিয়ে থাকে। আর একটা ব্যাপারে সে নিজে থেকেই ভীষণ সচেতন। আর তা হল ঠক লোকদের থেকে নিরীহ মানুষদের রক্ষা করা। আর এটাই যেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো মিশন।

বিপুলের এখন একজন সঙ্গী জুটেছে। বিষ্ণু। গতবার সে এসেছে। পরে বিষ্ণুর বাড়ির লোকজন বিশেষ খবর নেয়নি। শুধু এক পাড়ার দাদা খোঁজ পেয়ে এসে দেখেছে এই বাড়িতেই সে সবচেয়ে খুশিতে আছে আনন্দে আছে। তাই সে বাড়ি গিয়ে যখন বিষ্ণুর মাকে জানায় সে যেখানে আছে সেখানেই ভালো আছে তারপর আর বিশেষ কিছু চিন্তা করেননি। শুধু নিজের ছেলেকে দেখার জন্য মাঝে মাঝে বিপুলদের বাড়িতে আসত। বিষ্ণুর মা ছিল প্রায় একজন পাগল ব্যক্তি। তাই ছেলে যখন এখানে সুখে আছে তখন যেন সে বুকে শান্তি পেয়েছিল। তার দুমাসের মধ্যে বিষ্ণুর সেই পাড়াতুতো দাদা এসে বিপুলের মাকে জানায় বিষ্ণুর মা মারা গেছে। তারপর থকে বিষ্ণু স্থায়ীভাবে থেকে যায় এখানেই। সেও স্কুলে পড়ে। ক্লাস ফাইভ। বিপুলদের স্কুলেই। একসঙ্গে তারা দুজনে স্কুলে যায়। বাড়ি ফেরে। বিকেলে খেলতে যায়। তারা যেন নিজের আপন ভাই। নয় তো কী হয়েছে কেউ ধরতেই পারবে না তারা যে নিজের ভাই নয়।

এখন তীব্র গরম পড়েছে বলে স্কুল ছুটি দিয়েছে। সেদিন সামার ভ্যাকেশনের ছুটির নোটিশ নিয়ে যখন পিওন ক্লাসে এলেন তখন শতদ্রু স্যার পড়াচ্ছিলেন, কীভাবে ওজন স্তরে ছেদ পড়ছে।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং কী। কেন সি এফ সি বাড়ছে। কেন ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং মেশিন এই জাতীয় জিনিস ব্যবহার কমাতে হবে। হঠাৎ স্যারের ফোন বেজে উঠল। স্যার জোরেই বললেন, "হ্যালো, বলো।" ওদিক থেকে কী কথা এল বোঝা গেল একটু পরেই। যখন স্যার বললেন, " কিনব কিনব নতুন ফ্রিজ কিনব। দুটা দিন সবুর করো। ছুটিটা পড়ুক। কুয়োতে জলের বোতল ফেলে দাও, জল ঠান্ডা হয়ে যাবে। রাখো।"

বিপুলদের ক্লাসের কেউ কেউ ব্যাপারটা বুঝল না ঠিকই কিন্তু যারা বুঝেছে তাদের হাসির ঢেউয়ে তারাও মিশে গেল। এমন সময় পিওন আসাতে সবাই চুপ করে গেল। কারণ ছুটির খবর এলে সবাই একটু শান্ত হয়ে যায়। স্যার সেই নোটিশটা নিয়ে জানিয়ে দিলেন আগামী একমাস গ্রীষ্মবকাশ চলবে। তারপর সেই নোটিশ খাতায় নিজের সই করে দিলেন।
ঘন্টা পড়ল। স্যার বেরিয়ে গেলেন। ক্লাসের সবাই উল্লাসে মেতে উঠল। কাল থেকে একমাস ছুটি। ভাবা যায়! কত আনন্দ।

ছুটি পেয়ে দুদিন কাটল বিপুলদের। কিন্তু তারপর আর বিশেষ ভালো লাগছিল না তাদের এই অবসর। নেই জলদি ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসা। স্নান করা। চুল আঁচড়ানো।দুজনে বসে ভাত খেয়ে ড্রেস পরে স্কুলের জন্য রওনা হওয়া। আসলে নিয়মের মধ্যে একটু ভাঙন ধরলে মনেও তার প্রভাব পড়ে। আর এই ভাবনা বিপুলের মধ্যেও এসেছে। তাই একদিন সে বিষ্ণুকে সঙ্গে নিয়ে তিস্তা নদীর পাড়ে গেল। বিকেলে সুন্দর হাওয়া আসে। নদীর পাড়ে বসে থাকলে স্বাভাবিকভাবে মন ভালো হয়ে যায়। এই অসময়ে মাছ ধরা যায় না। তাই পাড় ধরে দুজনে হাঁটে। আর সন্ধ্যা নামলে পাখির ডাক দিয়ে ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল আর বিষ্ণুও ফিরে আসে বাড়িতে।

আজ সকালে দেখা হল সঞ্জয় বিট্টুদের সঙ্গে। বিপুল সঞ্চয়কে বলল, " সঞ্জয়, তোরা তো প্রতিদিন মাঠে খেলতে যাস না?"
"হ্যাঁ। এখন তো ছুটি প্রতিদিনই তো অনেকক্ষণ ধরে খেলি আমরা। তুইও তো আসতে পারিস আমাদের মাঠে।"
"সেটাই বলতে চাইছিলাম। স্কুল ছুটি দিয়েছে সময় কাটছে না।

২

টস হল। বিপুলদের হেড পড়ল। ব্যাটিংই নিল ওরা। বিপুলদের টিমে আছে সঞ্চয়, বিষ্ণু, নিবারণ, সাগর আর তন্ময়। আর অপর টিমে আছে বিট্টু, সুবল, নিতাই, সমীর, তমাল আর বিমান।

দুই দলের মধ্যে খেলা শুরু হল। চার ওভারে খেলা। শর্ট বাউন্ডারি। চার মারা। প্রথম ম্যাচটায় পঁয়ত্রিশ করতে পারল বিপুলদের দল। তমাল আর নিতাইয়ের বলে কেউ বিশেষ খেলতে পারল না। ফলে হারতে হল বিপুলদের। যদিও সঞ্চয় আর নিবারণ বেশ চেষ্টা করছিল উইকেট নেবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিততে পারল না।

পরের ম্যাচে ফিল্ডিং নিতে হল বিপুলদের। কিপারে দাঁড়িয়েছে বিষ্ণু। বল করছে নিবারণ। বাকিরা ফিল্ডিঙে ঠিকঠাক। প্রথম বলেই এবার আউট হল সমীর। রান আউট।
এভাবে ম্যাচ চলতে লাগল। কিন্তু অন্যদিকে কোথা থেকে যেন হঠাৎ বৈশাখের ঝড়ো হাওয়া শুরু হল। বৈশাখের বিকেলে এমন হাওয়া খুব কমই দেখা যায়। দুপুরেই এই হাওয়া হয় সাধারণত। কিন্তু আবহাওয়ার এমন পরিবর্তন কখন ঘটবে তা নিয়ে স্বয়ং আবহাওয়া দপ্তরও নিশ্চিত বলতে পারে না।

ঘন কালো মেঘের দল এসে জড়ো হল মাঠটায়। কালো হয়ে গেল চারপাশ। সন্ধ্যা নামতে এখনও অনেকটা সময় লাগবে। কিন্তু মেঘের ছায়ায় পুরো মাঠটা অন্ধকারে ছেয়ে গেল। এর মধ্যেও মাঠে খেলা থামল না। ব্যাট করছে সুবল আর বিট্টু। বল করল সঞ্চয়। হোয়াইট বল। পেছনে বিষ্ণু ছিল। বলটা সে ধরতে পারল না। এতক্ষণ সে মিলিয়ে মিশিয়ে ভালোই সেভ করেছিল বল কিন্তু এবার আর বলটা অন্ধকারের জন্য ধরতে পারল না। এমন সময় বাকিরা চিৎকার করে উঠল, "ঝড় ঝড়।" সত্যিই তাই। বৃষ্টির দাপুটে গর্জনে সকলেই ভয় পেয়ে যে যার মতো দৌড় লাগাল। কিন্তু এত বৃষ্টি এলেও বিষ্ণু বল খুঁজতে চলে গেলে জঙ্গলের কাছাকাছি। সবাই প্রায় অনেকটা ছুটে গেছে বাড়ির উদ্দেশ্যে।

বিপুল চিৎকার করে ডাকল বিষ্ণুকে।
"বিষ্ণু। বিষ্ণু। চলে আয়।"
কিন্তু বিষ্ণু সে কথা যেন শুনতে পেল না। বিষ্ণুর জবাব না পেয়ে বিপুল ছুটে গেল বিষ্ণুর কাছে। সে দেখল বিষ্ণু জঙ্গলের ভেতর তখনও এদিক ওদিকে হয়রান হয়ে খুঁজেই চলেছে বলটা। এদিকে মাঠ এখন জনশূন্য হয়ে গেছে। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ভারী বৃষ্টিই পড়ছে।
বিষ্ণুকে হয়রান দেখে বিপুল বলল, "বল থাকগা। পরে খোঁজা যাবে। বাড়ি চল বৃষ্টি পড়ছে।"
বিষ্ণু বলল, "দাদা পেয়ে গেছি ওই যে বলটা। ওই জঙ্গলটার ভেতরে লুকিয়ে আছে।" বলে নিতে গেছে বলটা এমন সময় পিছলে গিয়ে নিমেষের মধ্যেই বিষ্ণু হাওয়া হয়ে গেল! বিপুল এই দৃশ্য দেখে চমকে উঠল। তাঁর মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিল। শরীর কাঁপতে শুরু করছে। মাথা ভনভন করছে।
"বিষ্ণু, বিষ্ণু" বলে চিৎকার করল বিপুল। সেও এগিয়ে গেল। হঠাৎ সেও পিছলে পড়ল। তারপর একটা পাইপের মতো রাস্তা দিতে স্লিপ করে গড়িয়ে পড়তে লাগল বিপুল।

৩

বিপুল চোখ মেলে দেখল কে যেন তাকে ডাকছে। ঝাপসা চোখে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে বিষ্ণু।
"বিষ্ণু কোথায় এখন আমরা? প্রশ্ন করল বিপুল।
"জানি না দাদা" বলল সে।
উঠে বসল বিপুল। সে খেয়াল করল বিষ্ণুর জামা শুকনো এমনকি তার জামাতেও এতটুকু ভেজা নেই। অথচ বৃষ্টিতে তাঁদের দুজনের জামা ভিজে জবজবে হয়ে গেছিল।
"এ কোথায় চলে এলাম আমরা?" বিপুলের চোখে বিস্ময়।
"বুঝতে পারছি না দাদা, এ কোন দেশে এলাম আবার!" বিষ্ণুর চোখেও বিস্ময়ের ঘোর।

"বিস্ময় দেশে এসেছ তোমরা, বিস্ময় দেশে।" হঠাৎ কোথা থেকে যেন জবাব এল। বিপুল আর বিষ্ণু দুজনেই খুঁজতে লাগল জবাবের উৎসস্থল। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। একসময় সামনের

মোটা গাছটার পেছন থেকে একজন বৃদ্ধ বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, "দাদু ভাইরা তোমরা এখন বিস্ময় দেশে আছো।"
"বিস্ময় দেশে! মানে?" জানতে চাইল বিপুল।
"বিস্ময় দেশ মানে কী জানতে চাও?" বললেন বৃদ্ধ। বিপুল আর বিষ্ণু দুজনের চোখেই প্রশ্ন।
বৃদ্ধটি বললেন, "চলো তবে আমার বাড়িতে। সেখানে বসে সব বলব।"

বিপুলও ভাবছিল একটা কোথাও বসা দরকার। এই অচিনদেশে এসে পড়ে কেমন ঘাবড়ে গেছে একটু। তার উপর আবার বিষ্ণুও আছে। সে এখনও ছোট। সঙ্গে বিপুলকে না পেলে হয়তো খুবই ভয় পেত সে।
তাই বৃদ্ধের কথামতো তাঁরা এগিয়ে চলল। বৃদ্ধটি আগে আগে। আর দুই ভাই একসঙ্গে পাশাপাশি। হাঁটতে হাঁটতে দুজনেরই চোখে পড়ল চারপাশটা। কী অপূর্ব দৃশ্য! প্রথমে ভাবতেই পারেনি এমন একটা জায়গায় তাঁরা এসে পড়েছে। চারিদিকে বিরাট বিরাট গাছ। কত বাহারি ফুলের গাছ। রঙিন ফুলের সারি সারি। আর কিছুটা এগিয়ে দেখতে পেল বিভিন্ন চেনা অচেনা ফলের গাছ। প্রতিটা গাছে ফলের ঝুড়ি। আপেল, কমলা, আঙুর আরও কতশত সেসব ফলের গাছ। ভাবতেই পারছে না দুজনের কেউই। আর একটু এগিয়ে দেখতে পেল একটা পুকুর। স্বপ্নেও এমন দৃশ্য কোনওদিন কেউ দেখেছে কিনা তারচেয়েও সুন্দর সাজানো এই পুকুরটা। কতগুলো রাজহাঁস সাঁতার কাটছে। লম্বা লম্বা গলা উঁচু করে একপলক যেন বিপুলদের দিকে তাকাল মনে হল। বিপুল আর বিষ্ণু একে অপরের দিকে চেয়ে রইল। তারা কি কোনও স্বপ্ন দেখছে কিনা সে নিয়ে নিজেদের মধ্যে একটা সন্দেহ জেগে উঠেছে। দুই ভাই দাঁড়িয়ে পড়ল।
বিপুল বলল, "হ্যাঁরে ভাই, আমরা কি স্বপ্নের মধ্যে আছি?"
"আমারও তাই মনে হচ্ছে দাদা।"
"এক কাজ কর তো।"
"কী?"
"একটু চিমটি কাট তো হাতে।" বিষ্ণু সত্যিই চিমটি কাটল বিপুলের হাতে। অমনি বিপুল "আহ্" করে উঠল। আর বুঝতে বাকি রইল না তাঁরা আর যাইহোক স্বপ্ন দেখছে না।

"কী হল? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?" চিৎকার করে ডাকলেন বৃদ্ধ লোকটি। বিপুলদের পিছিয়ে পড়া এতক্ষণ লক্ষ্যই করেনি বৃদ্ধ লোকটি। দুই ভাই এগিয়ে গেল তাঁর কাছে।
বিপুল বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করে বলল, " আচ্ছা, দাদু এই জায়গাটার নাম কী?"
বৃদ্ধটি একটু যেন থমকাল। ঘুরে তাকাল বিপুলের দিকে। তারপর শুধু বললেন, "ওই যে দেখা যাচ্ছে বাড়িটা ওটাই আমার বাড়ি। চলো আগে তারপর সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।"
দুই ভাই দেখতে পেল সামনেই একটা বাড়ি। আর কোনও বাড়ি আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না। বৃদ্ধের কথামতো তাঁরা আর প্রশ্ন করল না বটে কিন্তু এই দুই ভাইয়ের মনেই কতগুলো এলোমেলো প্রশ্ন এসে বারবার তাঁদের উত্তেজিত করে তুলছিল। একটু পরেই তাঁরা বাড়িটাতে চলে এল।

বৃদ্ধটি বললেন, "তোমরা ওখানে বারান্দায় গিয়ে বসো। আমি তোমাদের দিদাকে ডেকে আনি।" বলে চলে গেলেন।

বাড়িটা ভীষণ পরিস্কার। ছিমছাম। মৃদু ফুলের সুবাস ভেসে আসছে। বিপুলের মনে হল যেন কেউ সবচেয়ে যত্ন দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পারফিউমটি বানিয়েছে। আর তার ঘ্রাণ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরেই বৃদ্ধটি ফিরে এল। আর তাঁর পেছনে একজন বৃদ্ধা হেঁটে আসছে। সেদিকে বিপুলের চোখ যেতেই সে চমকে উঠল। এ কী দেখছে সে! এ তো তাঁদের 'ভালো দিদা'! এখানে কীভাবে এল ভালো দিদা, সেই প্রশ্ন মাথায় ঘুরছে।

ভালো দিদা বিপুলকে দেখে বেশ খুশি হল। বলল, "ভাই বিপুল কতদিন পর তোকে দেখলাম। কেমন আছিস রে ভাই?"
"ভালো দিদা তুমি এখানে যে! আমি ভালো আছি। কিন্তু তুমি এলে কীভাবে?"
ভালো দিদা বলল, "তোদের সুরেশ কাকা কি আমাকে আর দেখত রে বল। তোরা তো দেখেছিসই কীভাবে আমার দিন কেটেছে না খেয়ে না পরে। যেদিন ওপারের মায়া কাটাতে

পারলাম সেদিন থেকেই এখানে আছি।" বলে চুপ করল ভালো দিদা।

বিপুলের বিস্ময় এখন কিছুটা কমেছে। গতবছরের কথাটা তার মাথায় এল। সে সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

তখনও বিষ্ণু বিপুলদের গ্রামে আসেনি। তার আগের ঘটনা। বিপুলদের বাড়ির গলিটা পার করে পরের গলিতে থাকত ভালো দিদা। দিদাদের একটা বাগান ছিল। সেখানে নানা ফল ফুল দিয়ে ঘেরা থাকত। সুরেশ কাকা ছিল ভালো দিদার একমাত্র ছেলে। কিন্তু মোটেও তাকে ভালো বলা যায় না। সবসময় নেশা করে বেড়াত। এ পাড়া ও পাড়ার নেশাখোর বন্ধুদের সঙ্গে মিশে একেবারে বখে গেছিল। ভালো দিদার নিজেরও বয়স হয়েছে খুব। তবুও অনেকরাত পর্যন্ত ছেলের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকত। ছেলে বাড়িতে এলে তবেই ভাত খেত। আর যদি অনেক রাত করে ছেলে ফিরে এসে বলত, "আমি খাব না। খিদে নেই।" তাহলে ভালো দিদাও আর ভাত খেত না। কখনও কখনও সারারাত না খেতেই কাটাত ভালো দিদা।

এর মাঝেই মাঝে মাঝে বিপুলরা বন্ধুরা মিলে ভালো দিদার কাছে যেত। দিদার কিছু কিছু কাজ করে দিত নিজে থেকেই। তখন ভালো দিদা তাদের আমটা কলাটা দিত। আর দিত রোদে শুকোতে দেওয়া আচারের বয়াম থেকে চালতার আচার, আমের আচার, কুলের আচার আরও কত কী। অবশ্য তখন সুরেশ কাকা বাড়িতে থাকত না বলেই বিপুলরা যেত।

তারপর একদিন সকালে ঘুম ভাঙার আগে মা বলল, "বিপুল শুনলি, তোদের ভালো দিদা কাল রাতে মারা গেছে!" শুনেই চমকে উঠেছিল সে। হুড়মুড় করে উঠে ছুট দিয়েছিল ভালো দিদার কাছে। গিয়ে দেখে লোকজন জড়ো হয়েছে। সুরেশ কাকা দাঁড়িয়ে আছে এককোণে। কিন্তু মায়ের মৃত্যুতে যেন তার কোনও দুঃখ নেই। চোখে এতটুকুও জল নেই। বরং মনে হচ্ছিল সে যেন বেশ খুশিই হয়েছে মায়ের মারা যাওয়াতে। আর সেই ভালো দিদা কিনা দিব্যি সুস্থ, সবল তাদের সামনে! বিপুলের চিন্তিত মুখ দেখে

বিষ্ণু বলল, "দাদা কী হল? কী ভাবছো? এই নাও দুধ।" বলে একটা বড়ো কাঁসার গ্লাস এগিয়ে দিল। ভালো দিদা বলল, "ভাই দুধ খেয়ে নাও অনেকদূর হেঁটে এসেছ, খেয়ে নাও।" বিপুল গ্লাসে চুমুক দিল।

দাদু আর ভালো দিদা দুজনেই এবার বসল। বিপুলদের দিকে চেয়ে ভালো দিদা বলল, "ভাই তুমি অবাক হয়েছ না আমাদের দেখে?

"হ্যাঁ, ভালো দিদা খুবই অবাক হয়েছি। সেদিন তোমার ওই চোখ বোজা মলিন মুখ দেখে আর থাকতে পারিনি। ছুটে চলে গেছি নদীর পাড়ে। সেদিনের মতো খারাপ দিন আর কখনও আসেনি আমার জীবনে। কিন্তু আজ আবার তোমাকে দেখে ভীষণ অবাক যেমন হয়েছি তেমনি ভীষণ আনন্দও লাগছে।"

ভালো দিদা বিপুলের জবাব শুনে খুশি হল। বিপুল বলল, "ভালো দিদা এই দাদুই কি তোমার স্বামী?"

"হ্যাঁ রে, তোরা তো দেখিসনি তোদের দাদুকে। এই সেই তোদের দাদু।"

" হ্যাঁ, মায়ের কাছে একবার জানতে চেয়েছি তোমার স্বামী কবে থেকে নেই। মা বলেছিল আমার জন্মেরও আগে থেকে।"

"ঠিক বলেছে তোর মা। লক্ষ্মীমন্ত মা তোর। কেমন আছে তোর মা? আর এই ভাইটি কে হয় তোর?"

" মা ভালো আছে দিদা। আর এ হল বিষ্ণু। আমার এক ভাই।"

"আচ্ছা, তোরা এখানে এলি কীভাবে বলতো?"

"আমরা তো মাঠে খেলছিলাম, ঝড় এসে পড়ল, আর খেলার বলটা খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এসেছি। কিন্তু তোমরা কী করে এখানে এলে সেটা এবার বলো।"

"আচ্ছা বলি তবে শোন।" বলে ভালো দিদা শুরু করল।

"যেদিন তোর সুরেশকাকা এসে আমাকে বলল সে আমাদের বাগানটা নাকি বিক্রি করে দিয়েছে কার কাছে। সে বাগান বিক্রির টাকাও নিয়ে নিয়েছে। জানতে পেরে আমার মনের অবস্থা একেবারে দুর্বল হয়ে গেল। সুরেশ আমার হাতের সই নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি ভেবে নিয়েছি এ জীবন থাকতে কখনই সেই বাগান বিক্রি করব না। রাতে প্রকৃতিদেবীর কাছে খুব

করে মিনতী করলাম। তিনি শুনলেন আমার কথা। তারপর সেই মাঝরাতে আমাকে তাঁর লোক পাঠিয়ে এখানে নিয়ে এলেন। এই প্রকৃতির মাঝে এসে আমার আর সেই দুঃখ রইল না।"

"আর দাদু তুমি এখানে কবে থেকে আছো?" বিষ্ণু প্রশ্ন করল দাদুকে।

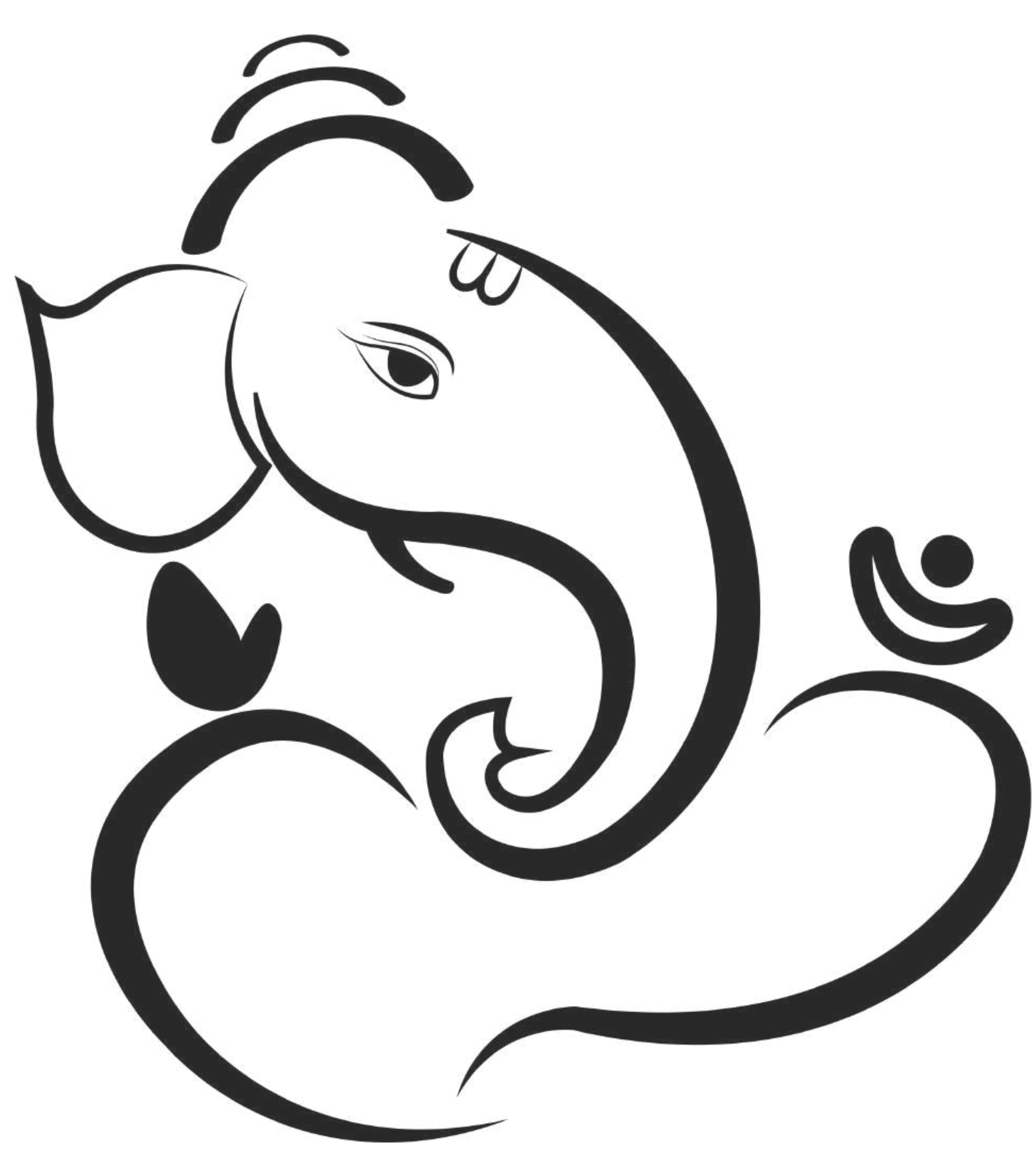
দাদু জবাব দিল," আমি তোমার দিদার অনেক আগে থেকেই এখানে আছি। তখন বাড়ির বাগানটাকে কেবল শুরু করেছি। রোজ নানা জায়গা থেকে গাছের চারা খুঁজে এনে লাগিয়েছি। চেনা অচেনা ফুলের চারা খুঁজে এনেছি কত দূর দূর থেকে। গরু ছাগলেও অত্যাচার করত খুব। চারদিকে সেজন্য ঘিরেও দিয়েছি। তারপর আমিও একদিন এক ভয়ংকর গল্প দেখলাম, আমার বাগানটায় আগুন লেগে গিয়েছি। কতগুলো দানব মানব এসে উপড়ে ফেলছে সব গাছ। সেই ভয়েই বলো আর গাছের প্রতি ভালোবাসাতেই বলো আমার হৃদয়ে আচমকা টান পড়ল। ব্যস তারপর বনের দেবী এখানে এনে এই বিরাট বাগানে এনে রাখলেন। সেই থেকেই এখানে আছি।"
বিপুল আর বিষ্ণু শুনে এতটাই আশ্চর্য হয়েছে যে তাঁরা কোনও কথা বলতে পারল না।

এমন সময় ভালো দিদা একটা সাদা বল হাতে নিয়ে বলল, " এই নাও তোমাদের হারিয়ে যাওয়া বল। অনেকটা সময় হল। বাড়িতে তোমাদের মা চিন্তা করছে যাও এবার ফিরে যাও।" বিষ্ণু দেখল হ্যাঁ, সেই বলটাই। যেটা খুঁজতে গিয়ে এত কাণ্ড।
"ধরো বলটা। সাবধানে থেকো তোমরা।" বলে বলটা বিষ্ণুর হাতে দিল। বিষ্ণু আর বিপুলকে দাদু বলল, "চলো, তোমাদের এগিয়ে দিয়ে আসি।"
ভালো দিদাকে ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করছিল না বিপুলের। কেমন যেন একটা হচ্ছে তার ভেতরে। চোখ কেমন ছলছল করতে শুরু হয়েছে। বিষ্ণুও টের পাচ্ছে সব।

"ভালো দিদা, ভালো থেকো। তোমরা খুব ভালো থেকো।" বলল বিপুল। বাড়ির পেছনে একটা জঙ্গলে পথ দেখিয়ে দাদু বলল,

," যাও ভাই, ওই পথে একটু এগিয়ে গেলেই তোমরা পৌঁছে যাবে।"

বিপুল একবার ভালো দিদা আর একবার দাদু দিকে পিছন ফিরে তাকাল। তারপর কী মনে করে যেন দৌড়ে গেল। আর ভালো দিদাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ভালো দিদা, তুমি খুব ভালো থেকো। নিজের দিদাকে কখনও দেখিনি। তুমিই আমার একমাত্র দিদা।"
আবার একনিমেষে বিষ্ণুকে নিয়ে সেই পথ ধরে এগিয়ে চলল। বল খুঁজে পেয়ে বিষ্ণু বেশ খুশিই হয়েছে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর বিপুলরা হঠাৎ খেয়াল করল তারা তাঁদের নিজের বাড়ির পেছনে চলে এসেছে। বিষ্ণু তা দেখে আবারও চমকে গেছে। কিন্তু বিপুল এবার আর চমকালো না। কারণ সে জানে সে বিস্ময় দেশ থেকে ফিরে এসেছে।
মায়ের গলা শোনা গেল, " ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে তোদের খেলা শেষ হয় না। এত দেরি করলে হবে। তাড়াতাড়ি ঘরে আয়।"
দুই ভাই সসম্মানে মায়ের কথা পালন করল।



গল্প



দেবব্রত সাহা

রতিকান্তবাবু বাতাসপুর বিধানসভা কেন্দ্রে পরপর দুবার বিধায়ক পদে জয়ী হয়ে পার্টির উর্দ্ধতনদের নেক নজরে পড়ে গিয়েছিলেন। সামনেই আবার বিধানসভা নির্বাচন। বাতাসপুর বিধানসভা কেন্দ্রের আপামর নেতৃত্ব যখন তাকে তৃতীয় বারের জন্য বিধায়ক পদে মনোনয়ন দিলেন, রতিকান্তবাবু বেঁকে বসলেন। বিধায়ক মনোনয়ন সভায় বিনীত কন্ঠে রতিকান্তবাবু বললেন – এবারে নূতন কোন তরুন কাউকে দাঁড় করানো হোক। প্রতিবার দাঁড়ালে ক্ষমতা ও ঔদ্ধত্য আমাকে গ্রাস করবে – এটা আমি এখন বুঝতে পারি। আমার মধ্যে একটা স্বৈরাতন্ত্রী মনোভাবের সৃষ্টি হবে যেটা পার্টির পক্ষে ক্ষতিকর। আগামী দিনের প্রজন্মদের যে স্ত্রী পুরুষ যেই হোক দলের উন্নয়নের স্বার্থেই নির্বাচনে লড়াই করার মানসিকতায় উজ্জীবিত করা উচিত। আমি সর্বান্তকরনে তাদের সাহায্য করব।

সভায় সবাই বিস্মিত হল। জেলা সভাপতি বয়সে নিশিকান্তর থেকে পাঁচ বছর বেশী হবে। তিনি সহাস্যে বললেন – এখনো তো বয়স পয়তাল্লিশ হয়নি এখনই বিধানসভা থেকে ছুটি নেবার পায়তারা করছ কেন? তুমি দলের একটা অ্যাসেট। এবার তো তোমাকে মন্ত্রীসভায় পাঠাব বলে ঠিক করেছিলাম যাতে মন্ত্রী হয়ে কাজ করাবার অভিজ্ঞতা অর্জন করে আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রীর দাবিদার হবে।

রতিকান্তবাবু বললেন – আমার এই দশ বছরের বিধায়ক হিসাবে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম সমাজের দ্রুত পট পরিবর্তন হচ্ছে। চাহিদার মানোন্নয়ন হচ্ছে। সেই আদ্যিকালের দাবী অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ছাড়াও গ্রামের সাধারণ লোকজন শহুরে জীবনযাত্রার কিছুটা ছোঁয়া পেতে চায়। আমার সার্থকতা যে এই বিধানসভা এলাকার জনসাধারনের অন্য, বস্ত্র, বাসস্থানের দাবী অনেকটা মিটিয়েছি। এখন চাই প্রত্যেকের জন্য শিক্ষা, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সর্বোপরি বর্তমান ডিজিটাল নেট ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন।

সভাপতি সাহেব বললেন – আর সেইজন্যই আপনাকে দরকার। প্রকৃত জনসংযোগের মাধ্যমে জনসাধারনের প্রত্যাশা পূরণে

আপনি আমাদের পথ দেখাবেন। আপনার বয়স বেশী হয়নি, এবং শারিরীক সমস্যার কথা তো কোনদিন শুনিনি। এখন বিরোধী দল কিছু কলকাঠি নাড়ছে কিনা সেটার খবর নিতে হবে। আপনি দলের একনিষ্ঠ কর্মী। সুতরাং দলবদলের ব্যাপার আপনার কাছ থেকে আশা করি না।

সভার সবাই সভাপতি সাহেবের কথার প্রতিধ্বনি করে সম্মিলিতভাবে রতিকান্তবাবুর জয়ধ্বনি দিয়ে তৃতীয়বারের জন্য বিধায়ক পদে প্রতিদ্বন্দিতা করার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল।

একান্ত বাধ্য হয়ে রতিকান্তবানু বললেন – আপনারা অন্য প্রার্থীর খোঁজ করুন। আমি তো রইলাম।

এইভাবে সেদিনকার সভা শেষ হোল। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত দশটা হয়ে গেল। এত রাতে আবার গ্যাস ধরিয়ে ভাতে ভাত ছাড়া কিছুই হবে না। ডিম রান্না করতে গেলে অনেক হ্যাঙ্গামা।

বালিশে হেলান দিয়ে রতিকান্তবাবু ভাবছিলেন সাধারণ মানুষের চাহিদার কোন শেষ নেই। রতন সর্দারের কথা মনে হোল। দুটো পাঁচ আর সাত বছরের সন্তান নিয়ে দিনের পর দিন উপার্জনহীন হয়ে না খেতে পেয়ে ছেলেপুলে নিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছিল। ওর বউকে গ্রামেরই এক বর্ধিষ্ণু বাড়িতে পরিচারিকার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। সে বউই বছর খানেক আগে পা ধরে ওর মরদের একটা কাজের ব্যবস্থার জন্য কি কান্না কাটি। বাধ্য হয়ে এলাকার প্রধানকে বলে একশো দিনের কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। জমির পাট্টা দিলেন, ঘর বানাবার জন্য পঞ্চায়েত থেকে সরকারী প্রকল্পের সুযোগ করে দিলেন বাচ্চা দুটিকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন যাতে দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। বিনা পয়সায় চাল ডাল পেতে লাগল। আর সে হারামজাদা রতন এখন একশ দিনের কাজে এখন আর বিশেষ যায় না। এই তো মানুষের চরিত্র। এদের উন্নয়নের জন্য আর কি কাজ করতে ইচ্ছা হয়।

এরকম অজস্র ঘটনা এই দশ বছর বিধায়ক জীবনে ঘটেছে।

নিজের আপ্রাণ চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও যারই একটু অবস্থা ভাল হয়ে গেলো তার নিজের থেকে আর কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না। তবুও জনসংযোগ করে যেতে হবে উদয়াস্ত। এদের ভোটটা পেতে হবে। দলের ভিত মজবুত করতে হবে।

খেয়ে দেয়ে রতিকান্তবাবু শুয়ে পড়লেন। শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এখনো অকৃতদার পয়তাল্লিশ ছুই ছুই রতিকান্তবাবু বাংলায় এম. এ. পাশ সাহিত্য তার হৃদয়ের আধখানা জুড়ে আছে আর আধখানা রাজনীতির জগত। তাই সময় সুযোগ পেলেই খাতা কলম নিয়ে সাহিত্যের আরাধনায় ব্রতী হন। দলের পত্রিকায় তাকে প্রবন্ধ লিখে দিতে হয়। সেই সব প্রবন্ধে অনেক হিসেব-নিকেশ করে শব্দচয়ন বাক্যবিন্যাস করতে হয়। সেখানে তার রচনা এক অদৃশ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। সেখানে হৃদয়ের উৎসব থাকে না, থাকে কেবল দল ও রাজনীতির কূট কাচালী।

সেই কলেজ, ইউনিভার্সিটি জীবন থেকে রাজনীতিতে এতো আকর্ষিত হয়ে পড়েছিলেন যে প্রিয় সহপাঠিনী বিধর্মী রেহেনা সুলতানার একান্ত অনুরোধ, অভিমান, অশ্রু বিসর্জন তাকে রাজনীতির আঙিনা থেকে ফেরাতে পারে নি। রাজনীতি ছিল রেহেনা সুলতানের দু চক্ষের বিষ। তার মনে রাজনীতি মানে ক্রুরনীতি; যে নয়কে ছয় করতে পারে, অজস্র অর্থহীন আশ্বাস দিতে পারে, কথার – মারপ্যাচে জনতাকে কাছে টানতে পারে, সুযোগ সন্ধানী হয়ে আখের গোছাতে পারে সেই একমাত্র রাজনীতিতে টিকে থাকতে পারে। না হলে শুধু দলের ঝান্ডা নিয়ে বয়ে বয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গভীর অবসাদে ডুবে যায়। তাই যত রতিকান্তবাবু রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে থাকলেন রেহানা সুলতানা এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে ধীরে ধীরে দূরে সরে গিয়েছিলেন।

প্রথমবার বিধায়ক হবার দু চারদিন পর রেহানা নিজে না গিয়ে অন্য একজনকে মারফত ফুলের তোড়া পাঠিয়েছিলেন। তখন রতিকান্তবাবু প্রথমবার বিধায়ক হয়ে এতো সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন যে উনি তখন অন্য জগতে চলে গিয়েছিলেন। ক্ষমতা, সম্মান, বিধায়ক হবার সূত্রে নানান সরকারী সুবিধায় হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। বরাবরের পরিচিত রেহানা সুলতানাকে তখন ভুলেই গিয়েছিলেন।

কিন্তু বিধায়কের গুরু দায়িত্ব কতখানি, কত সভা সমিতিতে উপস্থিত হয়ে জনসংযোগ বাড়াতে হয়। তার এলাকার ভূগোল, ইতিহাস, সংস্কৃতি হাতের তালুর মত করায়ত্ত করতে হয়। এটা করতে গিয়ে কিছুটা পড়াশোনা করতে হয়। এলাকায় এলাকায় নিজের অনুগত লোক রাখতে হয়। এ সব তার জানা থাকলেও এর জন্য যে এতো দৌড় ঝাপ করে বেড়াতে হবে সে সম্বন্ধে সম্যক ধারনা ছিল না।

বিধায়ক হিসাবে রতিকান্তবাবুর কাজের ধারা এবং জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলির বাস্তবায়নের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা সবার কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছিলেন। তাই দ্বিতীয় বারের জন এইদলের মনোনয়ন পেয়েছিলেন। এ দ্বিতীয়বারে জনসাধারণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সত্য করে প্রতিফলনের জন্য বিভিন্ন সরকারী অফিস, নিজ দলের কেন্দ্রীয় অফিসে তদ্বির তদারকি করতে গিয়ে রতিকান্তবাবু অনুভব করলেন যে দলের মধ্যে তার বিরুদ্ধ গোষ্ঠী অংকুরিত হচ্ছে। বাংলা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে যে সবাইকে সন্তুষ্ট করতে চায় সে কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারে না। সন্তুষ্ট এমন একটা জিনিষ যে এটা ক্রমশঃই বেড়ে চলে। রতিকান্তবাবু অনুধাবন করতে শুরু করলেন দলের সাধারণ কর্মী হিসেবেই কাজ করা সুবিধাজনক বিধায়ক পদ তার জন্য নয়। কারন মিথ্যেকে সত্যি বলে, অন্যায়কে ন্যায় বলে প্রতিপন্ন করার মানসিকতা তার নেই। আরো বহু ব্যাপার আছে তা চোখ বুজে সই করে দিতে তিনি অপরাগ। তার চারিত্রিক গঠন বিধায়ক হবার জন্য নয়। তাই মনে মনে স্থির করে নিয়েছিলেন। তৃতীয়বারের জন্য বিধায়ক পদের মনোনয়নে রাজী হবেন না।

কিন্তু দল তো ছাড়বে না। রতিকান্তবাবু মানে দলের একটা নিশ্চিত বিজয়ী আসন। এখন শাসক দলের জনপ্রিয়তা কমের দিকে। সাধারণতঃ বেশীদিন ক্ষমতায় থাকলে দলের মধ্যে উপদল তৈরী হতে থাকে। নানান বাহুবলী, অর্থ পিপাসুদের আস্তানা গড়ে ওঠে। উপরওয়ালাদের এক ধরনের সন্তুষ্টি ঘটে। নীচের তলায় গ্রাসরুট লেভেলে যে কিরকম ডামাডোল শুরু হয়েছে সে দিকটা আর খেয়াল রাখে না।

তাই মনস্থির করে নিয়েছিলেন এখন পর্যন্ত অকৃতদার ছেচল্লিশ ছুই ছুই রতিকান্তবাবু, বিধায়ক পদের আর দরকার নেই। দল রাজনীতি ছাড়তে পারবেন না কারণ রক্তে মিশে গেছে।

রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজসেবামূলক, জনগণের উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত করবেন।

চারদিক থেকে চাপ আসতে শুরু করল। এখন এই চাপ সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। কি করবেন ভেবে পচ্ছিলেন না। তিনি তার দলের সেন্ট্রাল কমিটিকে চিঠি লিখে তাকে অব্যাহতি দেবার জন্য আবেদন জানালেন। সেই সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে জানিয়ে রাখলেন বিধায়ক পদে দাঁড়াবার জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করলে সব ছেড়ে দেশ ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়বেন। ভারতবর্ষ নামক দেশটার কত প্রদেশে কত রকমের লোক বাস করে, তাদের সংস্কৃতি, তাদের চিন্তাধারা ইত্যাদি বুঝতে চেষ্টা করবেন।

এই কথা পল্লবিত হতে হতে কোন এক কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধানার কানে পৌঁছালো। ওই প্রধানা রতিকান্তবাবুর দলের মাসিক মুখপত্র নিয়ে লেখাগুলো পড়তেন। খবরের সত্যতা বর্তমান মাসের পত্রিকায় বেশ বড়ো করে দিয়েছে। একবার নয় দু বার পড়লেন। মনে মনে হাসলেন। এবার হয়ত তার প্রতীক্ষার অবসান হবে।

রবিবারের এক সকালে রতিকান্তবাবুর বন্ধ দরজায় সেই মহিলা উপস্থিত হলেন। ডোর বেল বাজাতেই রতিকান্তবাবু দরজা খুলে দিলেন। যাকে দেখলেন কল্পনা করেন নি কোনদিন তাকে দেখবেন। বিস্ফোরিত চোখে সেই বয়স্কা ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। ভদ্রমহিলা ঈষৎ হেসে বললেন ‘দরজায় দাঁড়িয়ে রাখবে, না ভিতরে যাবার অনুমতি দেবে’।

শশব্যস্ত হয়ে রতিকান্তবাবু বললেন ‘এসো এসো, ভিতরে সোফায় বসো। আমি ভাতটা চাপিয়ে দিয়ে আসছি।’

ভদ্রমহিলা দেখলেন ঘরটা একটা অকৃতদার পুরুষের যেমন অগোছালো থাকে সেই রকমই। একটু গুছিয়ে রাখবার কাজে হাত দিলেন। বিছানার চাদরের যা হাল তা পাল্টাতেই হবে। বইয়ের র‍্যাকে এলোমেলো, স্তূপীকৃত হয়ে ছিল বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, বই। সেখানেই হাত দিতেই রতিকান্তবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন – এর মধ্যেই ঘরটার ছিরিছাদ পালটে ফেলা হয়েছে? তোমরা মেয়েরা এ জিনিষটা ভাল করো। ভদ্রমহিলা সামান্য ম্লান হাসলেন। আর সেই হাসিটার দিকে চেয়ে থেকে রতিকান্তবাবু নিজেকে অসহায় ভাবলেন। এ ভদ্রমহিলার এই তপস্বিনী বেশের জন্য তিনি দায়ী । বিধর্মী নারীদের দেখে বোঝা যায় না যে এরা

বিবাহিত কিনা। স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করে কিনা।

একটু সাহস সঞ্চয় করে রতিকান্তবাবু বললেন – রেহানা, তোমার সঙ্গে কতকাল পরে দেখা। আগে তুমি তো এমন ছিলে না। সাজগোজ করে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আসতে। আজ আর স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে আমি সেই বয়সে মোহিত হয়ে দেখতাম। যে কোন ছলে আলাপ করে সময় কাটাতাম।

রেহানা বলতে পারল না যে সেই সাজ যে রতিকান্ত তোমার জন্যই। তোমাকে ভাল লাগত বলেই বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করতাম। তখনও ভালোবাসা বোধ জাগে নি। যে জিনিষটা আমি একদম পছন্দ করতাম না, সেই জিনিসটার মোহে যখন তুমি রাজনীতির আঙিনায় পা রাখলে। আমি পারলাম না তোমাকে সরিয়ে রাখতে। তখন আমি নিজেই দূরত্ব তৈরী করতে থাকলাম যত, ততই মনে হয়েছিল তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। তোমাকে ছাড়া আর কোন পুরুষকে জীবনে গ্রহণ করতে পারব না। আমি জানতাম তোমার চারিত্রিক গুণাবলীর সঙ্গে রাজনীতি খাপ খাবে না। একদিন ফিরবেই। তাই প্রতীক্ষায় রইলাম। আজ যখন শুনলাম তৃতীয় বারের জন্য বিধানসভার ভোটে দাঁড়াবে না, তখন মনে হল আমার প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। এখনি সময়ের সদ্ব্যবহার করে আমার ভালবাসার মানুষটির সঙ্গে বেহায়ার মত আলাপ করে আসি। রতিকান্ত, তোমার সব খবরাখবর আমি রাখতাম।

রেহানা মুখে বলল – আমাকে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেছো তাই তো রতিকান্ত। আরো আশ্চর্য হয়েছ এই তপস্বিনী বেশ দেখে। কি করব বলো হঠাৎ আলোর ঝলক নিয়ে তোমার সামনে দাঁড়ালে চিনতে পারবে কিনা?

রতিকান্তবাবু বললেন – ওসব কথা থাক। এই দশ বারো বছরে কিরকম সংসার সাজিয়ে বসেছ?

রেহানা হেসে বলল – তপস্বিনীর আবার সংসার কিসের? তুমি চলে গেলে রাজনীতির আঙিনায়, আর আমি ভেবে ভেবে সারা হয়ে বুঝতে পারলাম তোমার আর আমার মধ্যে আর অন্য কোন পুরুষের স্থান নেই। তাই তোমার প্রতীক্ষায় থাকলাম।

গল্প



মিঠুন মুখার্জী

অনেক বছর আগেকার এক হাড় হিম করা ঘটনা। আজও মানুষের মুখে মুখে এই কাহিনী শোনা যায়। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে একবার এই বাংলা থেকে ঘুরতে গিয়েছিলেন বিখ্যাত ডাক্তার জীবনানন্দ মুখার্জী। ভূত- প্রেতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর কথায়--- "এগুলো সবই মানুষের দুর্বলতার থেকে সৃষ্টি। ভূত বলে আসলে কিছুই হয় না। যে সমস্ত মানুষেরা ভূতের জন্য মারা গিয়েছেন, আসলে তারা সকলেই ভূতের ভয় থেকে মরেছেন। যারা বলেন নিজের চোখে আমি ভূত দেখেছি তারা হয় মিথ্যা কথা বলেন, নতুবা তাদের দেখার কোনো ভুল।" পঁচিশ বছর ধরে তিনি এদেশে ডাক্তারি করছেন। বিয়ে করেছিলেন চট্টগ্রামে। সারাবছরে মোটে একবার শ্বশুর বাড়ি যান তিনি। সেবার তাঁর মেয়ের জন্মদিন পালন করেছিলেন শ্বশুরবাড়িতে। মেয়ে স্বাগতা মুখার্জী বাবার চরিত্রের সম্পূর্ণ উল্টো। সে যেমন ঠাকুর বিশ্বাস করে, তেমনি ভূত-প্রেতেও তার বিশ্বাস আছে। মনে মনে একটু ভীতুও সে। তাই সন্ধ্যার পর একা একা কোথাও বেরোতে চায় না। কোথাও গেলে সঙ্গে মা অথবা কাজের মাসি থাকেন।

ডাক্তার জীবনানন্দ মেয়ের জন্মদিনের এক সপ্তাহ আগে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। নেমন্তন্ন করা থেকে শুরু করে কেনাকাটা করা, প্যান্ডেল, ক্যাটারিং, লাইটিং সবকিছুই বড়শালা রথীকান্তকে নিয়ে তিনিই করেছিলেন। অর্থের অহংকার তাঁর একেবারেই নেই। তাই মেয়ের জন্মদিনে কোনো ত্রুটি থাকুক, তিনি তা চাননি। তাছাড়া শ্বশুর বাড়িতে ছোট হওয়া যাবে না। সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচশো লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়, শালা-শালীদের আত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী, কাজের লোক কাউকে বাদ দেননি তিনি। হাড় হিম করা ঘটনাটি ঘটেছিল ডাক্তার জীবনানন্দের মেয়ের জন্মদিনের ঠিক দুদিন আগে। রথীকান্ত ও ডাক্তার জীবনানন্দ রাত আটটা নাগাদ বাজার থেকে কেনাকাটা করে একটা ভ্যানে করে বাড়িতে ফিরছিলেন। অন্ধকার রাত্রি, রাস্তায় তেমন আলো নেই বললেই চলে। শ্বশুরবাড়ি থেকে বাজারের দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটারের মতো। বাজারে যাওয়ার সময় চারিদিকে আলো ছিল। তাই অন্ধকারে সেই রাস্তাটা যে কত ভয়ংকর তা ডাক্তার বাবু বুঝতে পারেননি। কিন্তু রথীকান্তরা জানতেন সন্ধ্যাবেলার পর এই রাস্তাটি তেমন নিরাপদ নয়। কিন্তু জামাইবাবু সঙ্গে থাকায় তাঁর ভয়ে কিছু বলতে পারেননি তিনি।

ডাক্তার জীবনানন্দের শ্বশুর বাড়ির এক কিলোমিটার পর প্রায়

তিন কিলোমিটার ধরে বিশাল শালবন। সেই বন পার হলে কিলোমিটার খানেক দূরে বাজার। এই বাজারে যাওয়ার দুটি পথ আছে। বনের মধ্যে দিয়ে ছাড়াও একটু ঘুরপথেও বাজারে পৌঁছানো যায়। কিন্তু সেটা মোটামুটি আট কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। তাড়াতাড়ি হওয়ার কারণে সেদিন তারা বনের পথ দিয়েই বাজারে গিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরার সময় ভুল করে আবার সেই একই পথ ধরেছিলেন তারা। ভাগ্যে থাকলে ঠিকটাও ভুল হয়ে যায়। ভ্যানের সামনে একটি টেমি জালানো ছিল। তার মৃদু আলোয় পথ ঠিক করে দেখা যাচ্ছিল না। তাদের দুজনের কাছে দুটি টর্চ ছিল। রথীকান্ত ও তার জামাইবাবু নিজেদের মধ্যে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কথা আলোচনা করতে করতে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ রাস্তার ডান পাশের জঙ্গলের ভিতর থেকে একটি অমানুষিক কান্না ভেসে আসতে লাগলো। তারা দুজন অবাক হয়ে যান। ডাক্তার জীবনানন্দ রথীকান্তকে বলেন--- "এটা কিসের শব্দ? মনে হচ্ছে কোন মেয়ের! এই ঘন জঙ্গলে কি করছে সে? চলো তো আমরা একটু ওদিকে গিয়ে দেখি।" রথীকান্ত বলেন---"এখন দরকার নেই জামাইবাবু। এই ঘন বনের মধ্যে অনেক বিপদ আছে। আমাদের ভুল হয়েছে এই রাস্তা ধরে আসা। আপনি যাবেন না।" শত বারণ সত্ত্বেও ডাক্তার জীবনানন্দের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস তাকে বিপদের সম্মুখে এনে দাঁড় করিয়েছিল। ভ্যানটা দাঁড় করিয়ে তিনি টর্চ মারতে মারতে বনের মধ্যে ঢুকে যান। অচেনা অজানা জায়গা বলে একটুও ভয় পাননি তিনি। তিনি বলেন --- " কে এখানে এই অন্ধকারে? কে তুমি? কাঁদছ কেন?" এরপর বনের চারিদিকে টর্চ মেরে কেউ আছে কিনা দেখার চেষ্টা করেন তিনি। আস্তে আস্তে একটা গলার স্বর তাঁর কানে আসে। বলছে--" তোর মরার পাখনা গজিয়েছে? কে তুই ? তোর তো ভীষণ সাহস। এখানে মরতে এসেছিস?" এই গলার শব্দ শুনে ডাক্তারবাবু তাঁর সামনের গাছের ডালে টর্চ মেরে দেখেন, একজন যুবতী একটা সাদা কাপড় পড়ে বড় বড় চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। সারা মুখে রক্ত। তাকে দেখে তিনি খুবই ভয় পেয়ে বনের মধ্যে দিকহারা হয়ে দৌড় মরেন। মাঝে মাঝে রথীকান্তের নাম ধরে ডাকেন তিনি। রথীকান্ত ও ভ্যানচালক দুজনেই তাঁর গলা শুনতে পান। বড় বড় গাছের শিকড়গুলি এগিয়ে এসে তাঁর পাদুটিকে জড়িয়ে ধরে। এরপর একটি গাছের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে। ডাক্তারবাবু চিৎকার করতে থাকেন।

এদিকে ভ্যানচালক ও রথীকান্ত তার গলা শুনে টর্চ নিয়ে ভয়ে ভয়ে বনের মধ্যে যান। কিছুক্ষণ পরে তাঁকে খুঁজে পান অজ্ঞান অবস্থায়। তাঁকে দুজনে মিলে ভ্যানের কাছে নিয়ে আসেন। চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ডাক্তার জীবনানন্দের জ্ঞান ফিরে আসে। তাঁর চোখে- মুখে ভয়ের ছাপ। আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে রথীকান্ত তাঁকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বাড়ি ফিরে তিনি সকলের সামনে সমস্ত বিষয়টি খুলে বলেন। তিনি বলেন---"আমরা বারণ করা সত্ত্বেও জামাইবাবু সাহস করে ওই অন্ধকারের মধ্যে গিয়েছিলেন। কি হয়েছে উনিই পরিষ্কার বলতে পারবেন। আমরা ওনার চিৎকার শুনে যখন উনাকে আবিষ্কার করি, তখন জ্ঞান ছিল না। আজ একটা বড় অঘটন ঘটে যেতে পারত। ঠাকুরের অশেষ কৃপা।" সেই রাত্রে ডাক্তার বাবুকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। তিনিও চুপচাপ বিষয়টা নিয়ে সারারাত ভেবেছিলেন। এখনো তাঁর মনের মধ্যে বিশ্বাস হচ্ছে না, ভূত বলে কিছু আছে। ভোরবেলায় তাঁর দুটো চোখ অজান্তেই লেগে এসেছিল। পরদিন ঘুম থেকে উঠেছিলেন সকাল ন'টায়।

ঘুম থেকে উঠে তিনি শোনেন গতকাল রাত্রে ঐ শালবনে একটি যুবতী মারা গিয়েছেন। তার মৃতদেহ আজ সকালে একদল মানুষ কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে খুঁজে পেয়েছে। এই খবরটি পাওয়ার পর তিনি খুব চিন্তায় পড়ে যান। তাহলে কালকে রাতে যে মেয়েটির গলার আওয়াজ আমরা পেয়েছিলাম, এই মেয়েটি সেই মেয়ে নয় তো। তিনি শ্বশুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে মৃত মেয়েটিকে দেখেন। কিন্তু গতকাল সাদা কাপড় পড়া যে মেয়েটিকে তিনি দেখেছিলেন, এই মেয়েটি সে নয়। তিনি আরো চিন্তায় পড়ে যান। এই মৃত্যুর মধ্যে তিনি রহস্যের গন্ধ খুঁজে পান।

এই দিন সন্ধ্যাবেলা তিনি তাঁর ছোট শালা শশীকান্তকে নিয়ে সেই শালবনে যান। শশীকান্তও ছিলেন ডাক্তার বাবুর মতই সাহসী। সেও ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করতেন না। ডাক্তার জীবনানন্দের মন সর্বদাই বলছিল, আজও কোন অঘটন এই বনে ঘটবে। সকাল বেলা দুই শালার কাছেই এই বনের বিগত দিনের বিভিন্ন ঘটনা তিনি শুনে নেন। বড় শালা রথীকান্ত তাকে বলেন---"এই বনটি খুবই ভয়ংকর। গত তিন বছর আগে অনেকেই এখানে মারা গিয়েছিলেন। অনেককে আবার খুঁজেই পাওয়া যায়নি। অনেক তদন্ত চালানো হয়েছে পুলিশ দিয়ে। কিন্তু কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়নি। আপাতত বছর তিনেক আর কোন অঘটন ঘটার কোন খবর আমাদের কাছে নেই। আজ সকালে

এই প্রথম অনেকদিন পর একজনের মৃত্যুর খবর পেলাম। তবে অনেকেরই অনুমান এ সমস্ত ঘটনা সবই ভূত-প্রেতের ব্যাপার। এর মধ্যে না যাওয়াই ভালো।" ছোট শালা শশীকান্ত বলেছিলেন---"ভূত-প্রেতের বিষয়টা আমার ঠিক হজম হলো না। আমার মনে হয় কারো কোন শত্রুতা থেকে কিংবা কোন অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য এই মৃত্যু গুলো ঘটেছে। সরাসরি হত্যা করলে আইনের বেড়াজালে আটকে যেতে পারে। তাই এইভাবে ছক কষে বনের মধ্যে হত্যা করা হয়েছে, যাতে সকলে মনে করে এসব ভূত-প্রেতের কাজ। এর মধ্যে একটা বড় রহস্য আছে বলে আমার মনে হয়। ভালোভাবে তদন্ত চালাতে পারলে অবশ্যই আসামিকে ধরা সম্ভব।" ছোট শালার কথা শুনে ডাক্তার বাবু বলেছিলেন---"আমারও তাই মনে হয়। এগুলো সবই চক্রান্ত। ভয় দেখিয়ে ভৌতিক প্রক্রিয়ায় মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। আদেও ওই বনের মধ্যে কোন ভূত-প্রেত নেই। তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকো, তাহলে এই রহস্যের দ্বার আমি আর তুমি মিলে উদঘাটন করে ছাড়বো।" বড় শালাকেও থাকার জন্য তিনি বলেছিলেন। কিন্তু তিনি খুবই ভীতু প্রকৃতির মানুষ। তাই তিনি এর মধ্যে ঢুকতে চান নি। কোন উপায় না পেয়ে ছোট শালা শশীকান্তকে নিয়েই ডাক্তার জীবনানন্দ ওই শাল বনে গিয়েছিলেন।

তারা দুজনে দুটি টর্চ নিয়ে দীর্ঘ বনের মধ্যে এই রহস্যের তথ্য অনুসন্ধান করছিলেন। কিছুক্ষণ পর দূর থেকে দেখেন, দুই-তিন জন ব্যক্তি বনের রাস্তা ধরে আসছেন। হঠাৎ তাদের সামনে একটি বাঁশ পড়ে যায়। তারা ভয় পেয়ে যে যার মতো বনের মধ্যে দৌড়ে পালিয়ে যান। শশীকান্ত ও ডাক্তার জীবনানন্দ তাদের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করে দৌড়ান। কিন্তু সেই লোকটিকে আর খুঁজে পান না তাঁরা। শশীকান্ত বলেন---"কী হল বলুনতো দাদাবাবু? লোকটিকে আর দেখতে পাচ্ছি না। একজন জলজ্যান্ত মানুষ কোথায় ভ্যানিস হয়ে গেল?" মিনিট পাঁচেক খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ ডাক্তার বাবুর চোখে পড়ে একটা গাছে লোকটির মৃতদেহ ঝুলছে। গলায় গামছা দেওয়া। তিনি শশীকান্তকে ডেকে দেখান। তারা দুজনে টর্চ মেরে অনেকক্ষণ হত্যাকারীদের খোঁজেন। কিন্তু কিছুই খুঁজে পান না। ফেসে যাওয়ার ভয়তে তারা দুজন কোনো কথা না বলে চুপচাপ বাড়িতে ফিরে আসেন। শশীকান্ত ডাক্তারকে বলেন--"বিষয়টা অনেক জটিল লাগছে। এই রহস্য আমাদের দুজনের দ্বারা উদঘাটন করা সম্ভব হবে না। পুলিশের সহযোগিতা নিলেই এটা সম্ভব।"

পরদিন মেয়ের জন্মদিনের কারণে এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ তারা নিতে পারেননি। প্রতিটি কাজের মধ্যেও ডাক্তার বাবুর এই রহস্যের কথা বারবার মনে ভেসে উঠছিল। খুব আড়াম্ভরের সঙ্গে মেয়ের জন্মদিন পালন করেন তিনি। পুলিশ কর্তাদেরও নিমন্ত্রন ছিল জন্মদিনে। শশীকান্ত পুলিশকে সমস্ত বিষয়টি খোলসা করে জানান। পুলিশের বড়বাবু তাদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলেন--- " এগুলো যদি উদ্দেশ্যে প্রনোদিত হত্যা হয়ে থাকে, তবে আমি আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই আছি। আপনারা চিন্তা করবেন না। বাছাদের এবার আমরা এমন ফাঁদে ফেলব, যে ধরা ওদের পড়তেই হবে।" মেয়ের জন্মদিনে নাচ-গান থেকে শুরু করে কেক কাটা ও কব্জি ডুবিয়ে খাওয়া-দাওয়া সবই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁরা বুঝতেও পারেন না যে আজকের এই দিনে আরো ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে। অনুষ্ঠান শেষে শশীকান্তের বাড়ির পিছনের একটা আম বাগানে তাদেরই পাড়ার দুজন মানুষের ঝুলন্ত মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। তখন রাত এগারোটা বাজে। ওই আমবাগানের ভিতর দিয়ে তারা স্বাগতার জন্মদিনে আসছিলেন। কিন্তু আর আসা হলো না। কেন এরকম ঘটনা ঘটছে কেউই বুঝে উঠতে পারেন না। ওই রাতেই পার্শ্ববর্তী থানার পুলিশ সেখানে আসেন। আশেপাশের সকলের সাথে কথা বলেন তারা। সারা পাড়ায় একটা শোকের ছায়া নেমে আসে। যদিও রাত সাড়ে দশটার মধ্যে ডাক্তারবাবুর মেয়ের সমস্ত খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান মিটে গিয়েছিল। গ্রামের সকলেরই তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস। তাই সন্ধ্যা ছটা থেকে ব্যাচ বসিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের অনুষ্ঠানে যে পুলিশ অফিসার এসেছিলেন এই ঘটনা ঘটার আগেই তিনি চলে গিয়েছিলেন। ডাক্তার জীবনানন্দের একবার মনে হয় এই বিষয়টি নিয়ে বেশি জল ঘোলা করা কি ঠিক হচ্ছে! তাছাড়া তারা এখানে ঘুরতে এসেছেন। তারা চলে যাওয়ার পর যদি শ্বশুরবাড়ির উপর কোন রকম বিপদ নেমে আসে। তাহলে তার দায় তাদের নিতে হবে। আবার মনে মনে ভাবেন-- 'একজন মানুষ হয়ে আমারও তো কিছু দায়বদ্ধতা আছে। গ্রামের সরল মানুষেরা যেটাকে ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে করছেন, আসলে সেটি ভৌতিক ব্যাপার নয়। যারা এ কাজ করছে তাদের একটা বড় উদ্দেশ্য আছে। ফলে ধরতে পারলে সেই সকল উদ্দেশ্যে জল পড়ে যাবে। যথাযোগ্য শাস্তি দিতে পারলে এই গ্রামের মানুষেরাও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। ফলে নিজের চিন্তা শুধু না করে এটা করা

উচিত।' মেয়ের জন্মদিনের তিনদিন পর তাদের ট্রেনের টিকিট কাটা ছিল। ফলে এর মধ্যে তার উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা নিজেও বুঝতে পারেন না তিনি। তাই ফেরার টিকিট তিনি ক্যানসেল করিয়ে নেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা, বউ ও মেয়ে এ সমস্ত ঝামেলায় জড়াতে বারণ করেন। কিন্তু তিনি কারো কথাই শোনেননি। বরং সবাইকে বুঝিয়ে বলেছেন--- "আমি যদি এই কাজে সফল হই, তাহলে আপনাদের এই অশান্তি আর কখনো পোহাতে হবে না।" তিনি একজন ডাক্তার হলেও বিভিন্ন জটিল রহস্য উন্মোচন করার চেষ্টা করেন। গোয়েন্দাদের গল্প পড়তে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। তাই ফেলুদা, ঘনাদা ও ব্যোমকেশকে তার খুবই পছন্দ। মৃত্যুকে তিনি ভয় পেতেন না। তিনি বলতেন--'মরতে তো একদিন হবেই। যদি আমার কপালে মৃত্যু না লেখা থাকে, তবে কেউ মারতে পারবে না। রাখে হরি মারে কে।'

পরদিন তিনি শশীকান্তকে নিয়ে পুলিশ স্টেশনে যান। সেখানে গিয়ে বড় বাবুর সঙ্গে কথা বলেন। তারা তাকে জানান, এরকম ঘটনা আগেও অনেকবার ঘটেছে। কিন্তু আমরা কোন রকম প্রমাণ পায়নি, যে এ কাজ মানুষের। আমাদের মনে হয় এটা ভূত-প্রেতের কাজ। তবে আপনারা যখন বলছেন, তখন আপনাদের প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা পাশে থাকব। যেকোনো মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এরপর ডাক্তারবাবু তাদেরকে বলেন---"আজ রাত্রে আমরা যদি আপনাদের সহযোগিতা পাই, তাহলে এই হত্যাকারী দলকে আমরা অবশ্যই ধরতে পারব।" তাঁর কথা শুনে বড়বাবু তাঁকে বলেন---"আপনি আজ রাতে কি করতে চান বলুন। আমরা সমস্ত বিষয়টা বুঝে যেভাবে আপনাকে সহযোগিতা করা যায়, তা করব। ডাক্তার বাবু বলেন-- "তিন কিলোমিটার শালবনের মধ্যে এক একদিন এক এক জায়গায় মৃতদেহ পাওয়া গেছে। গতকাল আমার শ্বশুর বাড়ির পিছনের আমবাগানে। ভালো করে খেয়াল করলে বোঝা যাবে তারা কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এই হত্যাগুলি করছে না। তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। ফলে কোন নিয়ম মাফিক তাদেরকে ধরা কঠিন ব্যাপার। আমাদেরকে টোপ হিসাবে কাউকে ব্যবহার করতে হবে। তাকে ফলো করতে হবে আমাদেরকেই, যাতে তার কোন রকম অনিষ্ট না হয়। গত পরশুদিন দুপুরবেলায় আমি শশীকান্তকে নিয়ে ওই বনের ভেতর গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা এমন কিছু জিনিস পেয়েছি যা থেকে আমরা অনুভব করতে পেরেছি এই ঘটনাটা

পুরোপুরি সাজানো।" এরপর ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করেন, কী কী পেয়েছেন আপনারা? ডাক্তার বাবু বলেন --- "সেখানে আমরা কয়েকটি সিগারেটের খাপ, একগাছি দড়ি ও ফলস চুল পেয়েছি। অবাক হওয়ার বিষয় যে বট গাছের ঝুড়ি আমায় পেঁচিয়ে ধরেছিল তাও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কারোর দ্বারা করা হয়েছে। কিছু লম্বা লম্বা বট গাছের ঝুড়িও আমরা ওই ঘন জঙ্গলে পড়ে থাকতে দেখেছি। ওদের আসল উদ্দেশ্যটা কি সেটাই আমাদের জানার প্রয়োজন। কেন তারা এভাবে মানুষকে হত্যা করছে।"
এরপর পুলিশ অফিসার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন-- "আপনি কাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চান? তার যদি কোন বিপদ ঘটে যায়, তার দায়ভার কে নেবে?"এই কথা শুনে ডাক্তারবাবু বলেন---"এই কারণে আজ রাতে আমিই টোপ হিসাবে যাব। আমার লাইসেন্সওয়ালা একটি রিভলবার আছে। সেটি আমার সঙ্গে থাকবে। আপনারা আমার পেছনে পেছনে থাকবেন। আমি যেখানে যাব তার চারিপাশে দূর থেকে ঘিরে থাকবেন। আমার সামনে কোন ভূত-প্রেতের ছদ্মবেশধারির আবির্ভাব ঘটলে আমি চিৎকার করবো। অমনি আপনাদের হাতে থাকা সার্চলাইট সকলে আপনারা জ্বালিয়ে দেবেন। একবার যদি একজনকে ধরতে পারি তাহলে এদের পুরো দলটাকে আমরা ধরতে পারবো। কথায় বলে না 'কান টানলে মাথা আসে'।"

সকাল বেলার প্লান অনুযায়ী ডাক্তার জীবনানন্দ মুখার্জী সূর্য পাটে বসার পর ওই শাল বনে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শশীকান্ত ও পুলিশ অফিসার সহ মোট দশ জন। একমাত্র শশীকান্ত ছাড়া সকলের কাছেই আগ্নেয় অস্ত্র ছিল। ডাক্তারবাবু পায়ের মোজার মধ্যে তাঁর রিভলবারটি নিয়েছিলেন। পূর্বের প্লান অনুযায়ী তিনি একা একা একটি টর্চ হাতে নিয়ে শালবনের মধ্যের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাকে ফলো করছিলেন শশীকান্ত ও পুলিশেরা। হঠাৎ একটি গাছের ডাল ডাক্তার জীবনানন্দের সামনে ভেঙে পড়ে। তিনি সেই ডালটি পার হয়ে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। হঠাৎ একটি বিকট আওয়াজ শুনেন তিনি। শুনে তাঁর মনে হয় সত্যি সত্যি কোন ভূত-প্রেতের আওয়াজ। মনে সাহস থাকলেও প্রত্যেকেই কম বেশি ভয় পেয়ে যান। কিন্তু হেরে যাওয়ার মানুষ তিনি নন। পুলিশের বড়বাবু যেহেতু তাঁকে কথা দিয়েছিলেন সেহেতু তিনিও ফিরে যান নি। হঠাৎ করে

রাস্তার ডান দিকের জঙ্গলে একটি নূপুরের শব্দ শুনতে পান ডাক্তার জীবনানন্দ মুখার্জী। টর্চ মারতে মারতে শব্দ উদ্দেশ্য করে বনের মধ্যে এগিয়ে যান তিনি। তাঁর পিছু নেন অন্যেরা। বেশ খানিকটা জঙ্গলে ঢোকার পর নূপুরের শব্দ হঠাৎ থেমে যায়। তখন তিনি চারিদিকে টর্চ মেরে দেখতে লাগেন কেউ আছে কিনা। হঠাৎ দেখেন, তাঁর থেকে দশ হাত দূরে দুজন মহিলা সাদা কাপড় পড়ে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বনের মধ্যে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। এমন একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে যে তাঁর মন দোটানায় পড়ে যায়। কখনো মনে হতে থাকে এটা সত্যি সত্যিই ভৌতিক ব্যাপার। আবার কখনো মনে হয় পুরো ব্যাপারটাই বানানো। এরপর দুজনের মুখে তিনি টর্চ মারেন। সাহস করে তিনি যখন তাদের সামনে এগিয়ে আসেন, তখন হঠাৎ সেই দুজন মহিলা তার দিকে ঘুরে তাকান। তাদের মুখের অবস্থা দেখে সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে ডাক্তার জীবনানন্দ চিৎকার করে ওঠেন। আর পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো সমস্ত পুলিশেরা তাদের হাতে থাকা সার্চলাইট জ্বালিয়ে দেন। এত আলো একসঙ্গে দেখে সেই মহিলা দুজন থতমত খেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পালানোর চেষ্টা করে তারা। পুলিশ অফিসার বন্দুক তুলে বলেন---"তোমাদের চারিপাশ থেকে ঘিরে নেওয়া হয়েছে। তোমরা একদম পালানোর চেষ্টা করবে না। তাহলে আমরা গুলি করবো। আমাদের প্রত্যেকের হাতেই বন্ধু আছে।" এরপর অন্ধকার জঙ্গল থেকে পুলিশদের উদ্দেশ্য করে ইট ছোড়া হয়। কয়েকজন পুলিশ আহত হন। কয়েকজনের সার্চলাইট নষ্ট হয়ে যায়। যেদিক থেকে ইট বৃষ্টি শুরু হয়েছিল সেই দিকে উদ্দেশ্য করে পুলিশ গুলি চালান। চারজন পুলিশ সার্চলাইট নিয়ে সেদিকে দৌড়ে যান। তিনজন পুরুষের পেছনে ধাওয়া করেন এবং তাদেরকে ধরে ফেলেন। এদিকে ডাক্তার বাবু তাঁর রিভলভার বের করে ওই মহিলা দুটোকে তাক করে রেখেছিলেন। তারা কান্না জুড়ে দেয়। পুলিশেরা তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যান। মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুলিশ অফিসার ডাক্তার জীবনানন্দ ও শশীকান্তের সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার প্রশংসা করেন।

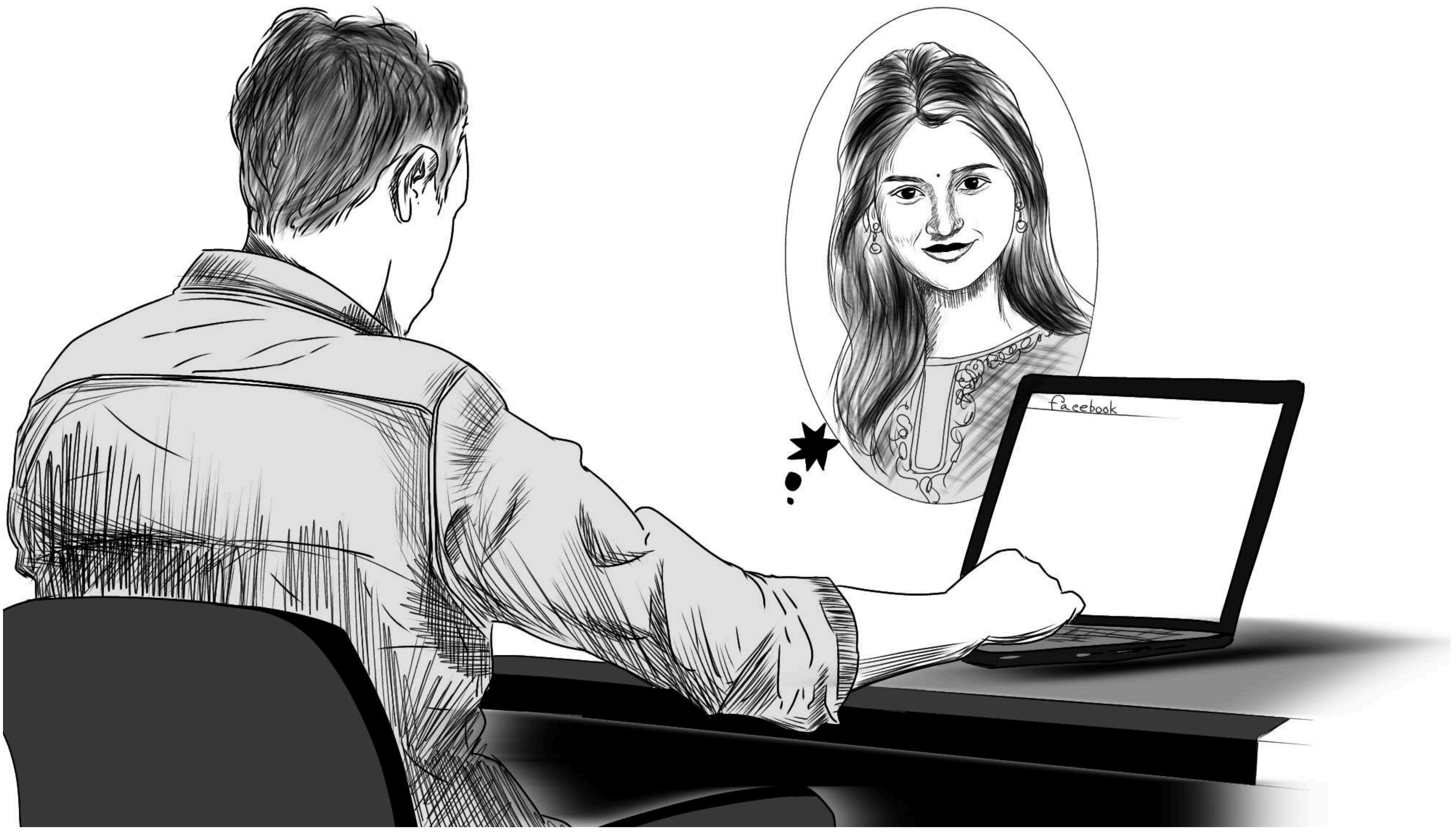
থানায় নিয়ে আসার পর প্রথমেই তাদেরকে প্রচন্ড মারা হয়। তাদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করা হয় তারা কেন এত দিন ধরে এতগুলো মানুষকে হত্যা করেছে। এর পেছনে আর কে কে লুকিয়ে

আছে তা জানার জন্য বাংলাদেশের পুলিশ অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই তারা মুখ খোলে না। ঢাকা থেকে স্পেশাল এক পুলিশ অফিসারকে নিয়ে আসা হয়। এই অফিসারের ট্রিটমেন্টে কাঠের পুতুলও নাকি কথা বলে। ছেলেগুলোর উপর থার্ড ডিগ্রী প্রয়োগ করা হয়। মেয়েদেরকে মেয়ে পুলিশ দিয়ে প্রচণ্ড মার মারা হয়। অবশেষে ভয় পেয়ে মেয়ে দুজন পুলিশের কাছে সব স্বীকার করেন। তারা বলেন ----"এই কাজের জন্য আমরা টাকা পাই। আমরা পাঁচজন ছাড়াও আরো পাঁচজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। এই হত্যার মধ্যে দিয়ে এখানকার সাধারণ মানুষের মনে তারা একটা ভয়ের জাগরণ ঘটাতে চায়। যাতে সন্ধ্যার পরে এই রাস্তা দিয়ে কেউ যাওয়ার সাহস না করে। সন্ধ্যার পরে এই জঙ্গলের মধ্যে নানান দুর্নীতিমূলক কাজ হয়। নারী পাচার থেকে শুরু করে হিরোইন-কোকেন-আগ্নেয়াস্ত্র বিভিন্ন জায়গায় পাচার হয়। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করেন তারা। আমরা তো চুনোপুটি।" এরপর ঢাকার পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করেন --- "এই পাঁচজন প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম বল। তোদের তো ফাঁসি হবেই। তাদের বাঁচিয়ে রেখে তোদের লাভ কী?" এই কথা শুনে একজন মেয়ে বলে --- "আমরা যদি তাদের নাম বলে দিই তবে ওরা আমাদের পরিবারের সবাইকে মেরে দেবেন বলেছেন। আমাদের কাছে নাম জিজ্ঞাসা করবেন না স্যার আমরা বলতে পারব না। জোর করলে আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না আমাদের।"প্রত্যেকের কাছেই একটা করে ব্লেড ছিল। স্পেশাল অফিসার বুঝতে পারেন ছেলেদের থেকে জোর করে নাম বের করা কঠিন ব্যাপার , মেয়েদের কাছ থেকেই সব জানতে হবে। পরদিন তিনি একজন মেয়েকে আলাদা ভাবে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বোঝান। তিনি বলেন -- " দেখো তোমাদের মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। তবুও একটা সুযোগ তোমাকে আমি দেবো। তোমার পরিবারের কিছুই হবে না। আদালতের কাছে আমরা আবেদন করব যাতে তোমাদের মৃত্যুদন্ড না দেওয়া হয়। ওই পাপিষ্ঠদের নাম তুমি বল,নতুবা আরও নিষ্পাপ মানুষের প্রাণ যাবে।" এরপরও মেয়েটি যখন কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে বসে ছিল,তখন ঐ অফিসার বন্দুক বের করে মেয়েটির কপালে ধরেন। ব্যাস ভয় পেয়ে মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে পাঁচ জনের নাম বলে দেয়।

প্রভাবশালী পাঁচজন অপরাধীর মধ্যে ডাক্তার জীবনানন্দ মুখার্জীর শ্বশুরের নামও ছিল। তিনি ওখানকার একজন নামকরা রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। কয়েক বছর আগে একবার পঞ্চায়েত প্রধানও হয়েছিলেন। এই সকল দুর্নীতি করেই আজ ফুলেফেঁপে উঠেছেন। ছোটছেলে বাবার চলাফেরা কোনো দিনই পছন্দ করতেন না। অনেক সাবধান করেছিলেন তিনি তার বাবাকে। কিন্তু শোনেন নি। পুলিশ সব সত্য জানার দুইদিন পর পাঁচ প্রভাবশালী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। লজ্জায় ডাক্তার জীবনানন্দ আর পুলিশ স্টেশনে যান নি। মনে মনে ভেবেছিলেন --- "অপরাধ যিনি করবেন তাকে শাস্তি পেতেই হবে। সে আপন হলেও ক্ষমার অযোগ্য।" কয়েকদিন পর তিনি তাঁর মেয়ে স্বাগতা ও বউ ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন। মনের মধ্যে একরাশ হতাশা থাকলেও এটা ভেবে তাঁর আনন্দ হয়েছিল যে, দোষীদের তিনি যোগ্য শাস্তি দিতে পেরেছিলেন।

গল্প

গল্প হলেও সত্যি



রাণা চ্যাটার্জী

"আপনি কোথাও ভুল করছেন ম্যাডাম।আমি তো আপনাকে কিছুতেই চিনতে পারছি না,একটু যদি নিজের পরিচয় দেন" এই ছিল সুনন্দ স্যানালের প্রথম উত্তর।ততদিনে ওই অপরিচিতা মহিলার অনেকগুলো ম্যাসেজ জমতে জমতে ইনবক্স ভিড় করে ফেলেছে!

আসলে হয়েছে কি, সুনন্দের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট কোনভাবে পাসওয়ার্ড হারিয়ে খোলাই যাচ্ছিল না। অনেক ঘাঁটাঘাঁটি ,চেষ্টার পরেও ব্যর্থ প্রচেষ্টায় খুলতে না পেরে অগত্যা নিজের নামে আর একটা অ্যাকাউন্ট খোলে সে।তবু এতদিনের একাউন্ট,কত বন্ধু,কতকিছু পোস্ট সেগুলোকে নিমেষে হারিয়ে বেশ দমে গেছিলো।

সুনন্দ প্রায়ই মিস করত পুরনো ফেসবুক অ্যাকাউন্টের বন্ধুদের । তাদের বেশিরভাগই বাইরের দেশের হওয়ায়,তাদের আদব কায়দা,কথপোকথনে সেই সব দেশের আচার আচরণ,শিল্প সংস্কৃতি,উৎসব এসব তাকে আকর্ষণ করতো বরাবর।আসলে সুনন্দের মধ্যে একটা দারুণ গুণও ছিল। খুব সহজেই সে অন্যের সঙ্গে মিশে মানিয়ে নেওয়া ,অন্যকে চটজলদি আপন করে নেওয়ার সহজাত দক্ষতা ও সরলতার অধিকারী ছিল।

পুরনো অ্যাকাউন্ট খুলতে না পারার কষ্টের প্রলেপে,নতুন ফেসবুক আইডি, মলম হয়ে যখন ক্ষত প্রায় সারিয়ে তুলছিলো,একদিন অফিসের লকারে ,পুরানো ডায়েরির পাতায় পাসওয়ার্ডটা লেখা পেতেই আনন্দে আটখানা হয়ে ওঠে সুনন্দ। পাসওয়ার্ড ফিরে পাওয়ার শুভ মুহূর্তেই ফেসবুক লগ ইন করে দেখে বাপরে বাপ,পায় হাজারের উপর নোটিফিকেশন। সব ধীরেসুস্থে দেখতে দেখতেই নজর পড়ে রুশা চৌধুরী নামে এক অপরিচিতা মহিলার প্রচুর ম্যাসেজ। যিনি কিনা খুব ঘন ঘন ম্যাসেজ করেই গেছেন লাগাতার এই ক মাস।খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব মেসেজগুলো দেখে শুনে সুনন্দ বুঝতে পারল ইনি নিশ্চয়ই তাকে ভুল ভেবে ম্যাসেজ করে চলেছেন ন য়তো বা কাউকে খুঁজছেন! কেমন যেন হন্যে হয়ে খোঁজার আকুতি সব ম্যাসেজ জুড়ে!

ওনার ম্যাসেজ গুলো খুবই সরল ছিল,এই রকম

কেমন আছো সাড়া দিচ্ছনা যে ,!"
"সনু ,তুমি ভালো আছোতো ?"
এভাবে ছেড়ে যাচ্ছ আমায়!
কতদিন কথাই বলো না !
কি হয়েছে তোমার ?!

এই ধরনের এক একটা লাইনে নিহিত ছিল প্রিয়জনকে হারিয়ে ফেলার আকুতি, কাছের কাউকে খোঁজার!আপনারা কি ভাবছেন ,কোনো ফাঁদ তাই তো?হ্যাঁ,সে তো দিনকাল খারাপ, সেটা সুনন্দ যথেষ্টই জানে।তবু কোথায় যেন তার মন অনুভব করেছিল,হতেও তো পারে সত্যি সত্যি কাছের বন্ধুটিকে আচমকা প্রযুক্তি গত ভুলে হারিয়ে ফেলেছেন সমুদ্র সমান অনলাইন জগতে!তাই হয়তো মহিলা চরম আফসোস নিয়ে বন্ধুকে খুঁজছেন যাকে তার প্রয়োজন।সেইসঙ্গে সুনন্দর মনে এটা খটকাও লাগছিল,তাকে কেন ম্যাসেজ পাঠাচ্ছে!

সে দিনটা ছিল শনিবার,সুনন্দ পরিচয় জিজ্ঞেস করতেই ,অপর প্রান্ত থেকে আবার প্রশ্ন আসে,
" আগে বলো তুমি কেমন আছো ?কেন আনফ্রেন্ড করেছো আমায়?একটা যেন কোথাও জোড়, অধিকার প্রশ্ন করার মধ্যে,এটা উপলব্ধি করে সুনন্দ লিখেছিল ,"হ্যাঁ,আমি ভালো আছি কিন্তু আপনি কে ,আমাকে কি সত্যিই চেনেন"? পরক্ষনেই উত্তর এসেছিল "চিনতে পারছ না এখন আমায় কিনা এড়িয়ে যাচ্ছ !? আমার কিন্তু মন বলছে তুমি আমার বন্ধু সনুই ।"

আচ্ছা সমস্যায় পড়লো তো সুনন্দ,এই সব সাতপাঁচ ভাবনা তার মাথায় ঘুরছে কেবল। সমাজ বিদ্যার ছাত্র হলেও এই বিষয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত "মনস্তত্ত্ব" ভীষণভাবে আকর্ষিত করতো তাকে। ফ্রয়েডের চিন্তাভাবনা,স্বপ্ন তত্ত্ব,মানুষের জটিল মন,চেতন অবচেতন এইসব আগ্রহের বিষয় বরাবরই তার অতি পছন্দের তালিকায় ছিল।

চাকরির শুরুতে সুনন্দ বছরখানেক দিল্লিতে সরকারী প্রকল্পে কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করেছিল।সে সামনে থেকে উপলব্ধি করেছে সাক্ষাৎকার সহ কথা বার্তায়, মাতাল ব্যক্তি হোক আর প্রসূতি,বখে যাওয়া সন্তান বা আফিম নেশা গ্রস্থ ব্যক্তিগণ বা মানসিক ভারসাম্য হীনদের সাথে একটু বন্ধুর মতো মিশলে তারা গল গল করে সব উগরে দেয় তাদের যাবতীয় সমস্যা সহ।অর্থাৎ কথোপকথনে, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির একটা বন্ধুত্বমূলক পরিবেশ তৈরি করতে পারলে আখেরে উপকার হয় মানসিক চাপ গ্রস্থ ব্যক্তির।যদিও সুনন্দ এটা নিশ্চিত নয় যে ,এই অপরিচিতা রুশা চৌধুরীর কোনো মানসিক চাপ চলছে ! তবে ওনাকে একটু সময় দেওয়া উচিত বন্ধুর মতো মিশে ,আর এটা যে খুব দরকার সে বিষয়ে সুনন্দের কোনো দ্বিমত নেই,যদি সত্যিই ওনাকে উপকার করা যায়।

এই কদিনে সামান্য চ্যাট করে সুনন্দ ,রুশা কে কিছুটা হলেও বোঝাতে সক্ষম হয়েছে,যে,উনি যে সুনন্দকে খুঁজছেন ,এই সুনন্দ সে নয়।প্রমান স্বরূপ সুনন্দ তার নতুন ফেসবুক আইডি দেখতে দিয়েছে,যেখানে তার পরিবার,সহধর্মিনী,মেয়ের ছবি আছে। সুনন্দ উপলব্ধি করেছে,যত সে নিজেকে অন্য সুনন্দ,তার সনু নয় এটার প্রমান দিয়েছে,রুশার যেন একটু একটু করে আফসোসের পাল্লা ভারী হয়েছে,ফুটে উঠেছে কখনো হতাশা,কখনো বিরক্ত করার জন্য দুঃখবোধ।

বন্ধুর মতো মিশে সুনন্দ পরিবেশ হালকা করে দিতেই জড়তা কাটিয়ে রুশা জানিয়েছিল ,"এই নামে এক বন্ধু ফেসবুকে ভীষণ আপন হয়ে যায় তার। প্রতিদিন তারা কত গল্পই না করতো। তিনি ভয়ঙ্কর রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সন্তান হওয়ার পর,নার্ভ জনিত সমস্যায় একপ্রকার জর্জরিত।এতটাই বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল যে,কচি বাচ্চার পাশে উনি মরার মত অবশ শরীরে শুয়ে দিন কাটাতেন।কোন শক্তি ছিল না,নড়া চড়া করার,চুপ করে মরা মানুষের মত পড়ে থাকতেন মাসের পর মাস আর সিলিং এর ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবতেন, একদিন যদি দাঁড়াতে পারি,ঠিক ঝুলে যাবো"।এই সব কথা গুলো শুনে সুনন্দের একদম ছবির মতো ভাসতো রুশার অসহনীয় পরিবেশ,মানসিক অবস্থা।

রুশা আরো জানিয়েছিলেন,"আশে পাশের প্রতিবেশী যারা দেখতে আসতো ,তাঁদেরকে উনি জনে জনে আকুতি নিয়ে অনুরোধ করে বলতেন ,আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে যাও না গো তোমরা কেউ,নইলে ও মারা যাবে আর বাঁচবে না।" ঠিক এই প্রতিকূল পরিবেশে সুনন্দ সান্যাল নামে এক বন্ধুর আবির্ভাব হয় রুশার ফেসবুকে, সে তাকে এতটাই উৎসাহিত করতো সে ঋণ ভোলা সম্ভব নয় ।তার জন্যই রুশা ,একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠেছে।বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়ে রুশাকে,মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে স্বামীকে কে নিয়ে ফ্লাইটে করে মরা মানুষের মতো ব্যাঙ্গালোরে যাওয়া করিয়েছে। কখনো কলকাতার ডাক্তার,কখনো গৌহাটির ডাক্তার এই সব করে ,ওই সুনন্দর জন্যই যখন বেঁচে ওঠা, নতুন এই জীবন,ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ করে সুনন্দ তথা তার সনুর গায়েব হওয়া। যত শুনছিলো,খুব খারাপ একটা মনকষ্ট সুনন্দকে আরো যেন গুম করে তুলছিল।কিন্তু কি আর করতে পারে,সে যে অক্ষম সেই রুশার সুনন্দের জায়গা পূরণ করতে।

তাকে হন্যে হয়ে খুঁজতে ফেসবুকে যত ওই এক নামের "সুনন্দ সান্যাল"পেয়েছে ,রুশা তাদের প্রত্যেককে মেসেজ করেছে ,যদি তার সুনন্দ,সনুকে খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু এটা দুর্ভাগ্য যে কেউ উত্তর দেয় নি কেবল সুনন্দ ছাড়া।আর একদিন রুশা,ভীষণ আবেগতাড়িত হয়ে বলেছিলো,"আমার মন বলছে আপনি আমার সেই বন্ধু ,প্লিজ বলুন না ,কেন এমন করে দূরে সরে গিয়ে শাস্তি দিচ্ছেন আমায়,আমি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ছি আমি হয়তো আর বাঁচবো না " মাঝে মাঝে এসব শুনে ভীষণ অসহায় লাগতো সুনন্দের ,ভাবতো এ কাকে ও এত করে বোঝালো,প্রমান দিলো,গিন্নির সাথে পরিচয়ও সব কি তবে বৃথা,এখনো কিনা ভেবে চলেছে এই সুনন্দই তার পূর্ব পরিচিত,হে ভগবান! এর উত্তর ও সে পেয়েছিল রুশার কাছে,রুশা বলতো আর অবাক হতো,দুটি ভিন্ন মানুষ হয়েও আচরন,ম্যাসেজে ব্যবহৃত শব্দ সমুহেরও কি সাংঘাতিক নাকি মিল।রুশার এসব কথার কোনো বিজ্ঞান সম্মত জবাব দিতে পারে নি সুনন্দ,বুঝতো রুশার জীবন ওই সুনন্দ নামেই বিভোর হয়ে রয়েছে।

ঘটনার গভীরতা যে কত দূর শেকড় ছড়িয়েছিল, বুদ্ধিমান সুনন্দের বুঝতে বাকি ছিলনা।ততদিনে সুনন্দের জানা হয়ে গেছে তার বাপের বাড়ি মুর্শিদাবাদের কান্দিতে।উনার স্বামী কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদে কর্মরত ও রুশারা থাকে গৌহাটি ।আস্তে আস্তে খুব ভালো বন্ধু হয়ে সুনন্দের একটা বড় গুন ছিল,কোন কিছু লুকোছাপা না করে, ফ্রি ভাবে বন্ধুর মতো মিশে যাওয়া,যেন কতখানিই না সে চেনে। তাই প্রতিটা বিষয়ে সে গল্প করতো,ছোট ছোট বিষয় গুলোকে চেষ্টা করত খেয়াল রাখার। ব্যস্ত কৃত্রিমতার জীবনে এই উপলব্ধিটাই সত্যি বলতে কি অনেক। সুনন্দ তার সহধর্মিনী রমার সাথেও ফেসবুকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলি। যখন ওরা দুজন পরমা, ও রুশা গল্প করতো ভীষণ ভালো লাগতো দেখে সুনন্দের,আর তার মন বারংবার প্রার্থনা করতো যেন রুশার আগামী ভালো কাটে।

ভোটের ডিউটিতে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা, খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হল,শোবার রাত্রে কোনো অসুবিধা নেই তো এই সব খুঁটিনাটি রুশা বার বার খবর নিচ্ছিল সুনন্দকে ফোন করে সুনন্দের সহধর্মিনী পরমার মতোই।পরে অবশ্য এক প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করে,সে তার অপরিহার্য বন্ধু সনুকে মনে করেই এত খুঁটি নাটি ফোন,খবরাখবর নিয়েছিল! ওই অচেনা পরিবেশ,কিন্তু অচেনা হলেও আপন করে নেওয়া রুশার খোঁজ খবর,নিজেকে খুব গর্বিত লাগছিল সুনন্দের। সে খুব অবাক হয়ে ভাবতো,এত ভালো বন্ধু পেয়ে যে কেউ হঠাৎ গায়েব হয়,এটাই চরম অবাক হওয়া বিষয়।কখনো তার মনে হতো, অনেকবার বলতে চেয়েও বলতে পারেনি যে,"রুশা,তোমার সনু হয়তো ফেক আইডি ছিল, তোমার ইমোশনকে কাজে লাগিয়ে গায়েব হয়েছে" আবার এটাই বা বলবে কি করে, সে তো সত্যিকারের বন্ধুর মতো কাজ উৎসাহ দিয়ে সুস্থ করে তুলেছে, সত্যিই তার অনেক অবদান।

"কিন্তু সে চলে গেল কেন ,তবে কি তার কোনো বিপদ হয়েছে" এই চিন্তা করে রুশা আবার একদিন বলছিল, "আমি কিভাবে বিশ্বাস করব বলতে পারেন আপনি অন্য ব্যক্তি,এতো মিল আপনাদের দুজনের মধ্যে, আদব কায়দা,আচরণ

,এমনকি ম্যাসেজ লেখার ধরনও"-এর কোনো উত্তর দিতে পারে নি সুনন্দ বিস্ময় ভরে। সুনন্দ অবশ্য বারবার ,রুশার কাছ থেকে তার সনুর ছবি চেয়েও ব্যর্থ হয়েছিল ,পরে অবশ্য রুশা ছবি দেখিয়েছিল কিন্তু বলেছিল ,"ওর ছবি দেখানোর দিব্যি দেওয়া আছে "।সুনন্দের মাথায় ঢোকেনি ,একটা ছেলে কখন বলতে পারে,যে তার ছবি কাউকে না দিতে,এর জন্য দিব্যি দেওয়া কিসের! তবে ছবিটা দেখে কিন্তু সুনন্দ সান্যাল এর মানুষটাকে বেশ ভালই লেগেছিল অনেকটা তার মত যেন ভাবুক,উদাস চাহনি,খুব সুন্দর মিষ্টি মুখমণ্ডল। হঠাৎ করেই একদিন রুশা আবেগ তাড়িত হয়ে জানালো যে," জানো কি হয়েছে,তার সুনন্দ মানে সনু ফিরে এসেছে"- এক ঝলক খুশির মাঝেও উদাস, অভিমানী গলায় বলেছিল সুনন্দ,"খুব খুব ভালো খবর রুশা, তবেতো আমার ছুটি বন্ধু, আসি এবার, বিদায় নেওয়ার পালা আমার"! অথচ সুনন্দ এসব চাইলে কি হবে,মনে আছে হোয়াটসঅ্যাপে রুশা ভয়েস দিয়ে আবেগ তাড়িত হয়ে বলেছিলো, "প্লিজ এভাবে বলোনা ,আমি তোমাকেও কোনদিন হারাতে চাই না ।কথা দাও কোনোদিন তুমি এভাবে ভাববে না,তুমি ওই সময় আমায় পাশে থেকে উৎসাহ না দিলে আমি হয়তো মরেই যেতাম এতদিনে।তোমরা দুই সুনন্দ আসলে আমার কাছে একই মুদ্রার দুই পিঠ। "

এই কথা গুলো শুনে আর কিছু বলার থাকতে পারেনা, আজও সুনন্দ ও রুশা পরস্পরের খুব ভালো বন্ধু।মানুষের জীবনে কোথাও এমন ভালো বন্ধু,খুব খুব দরকার ।একদম যেন দখিনা বাতাস হয়ে বিরাজ করে দুজনে হাত বাড়ালেই বন্ধুর মতো।রুশার সুনন্দ ফিরে এলেও, সে আর রুশা আছে নিজেদের মতো ,তাতে এই সুনন্দ সান্যাল ও রুশা চৌধুরীর বন্ধুত্বে কোনো চিড় ধরে নি,ধরবেও না এই বিশ্বাসেই উভয়ে কোনোদিন সাক্ষাৎ না করলেও দিব্যি খাসা আছে ফেসবুক আইডির পাসওয়ার্ড ভুলে আলাপের সূচনা থেকে।তবুও সুনন্দ বুদ্ধিমান,সে বোঝে প্রত্যেকের জীবনে নিজস্ব স্পেস দরকার।যখন অসুস্থ রুশা একাকিত্বে ভুগছিল,সুনন্দ উপলব্ধি করেছিল ওর সামান্য উপস্থিতি যদি রুশাকে ভালো রাখে সেটাই হবে তার পরম প্রাপ্তি। ভগবান মুখ তুলে তাকিয়েছেন ,যে সুনন্দকে খুঁজছিল রুশা তাকে

একদম সামনে এনে হাজির করে। ভাবলে সিনেমার মতো লাগলেও এমন যে বাস্তবে তার সাথে ঘটেছে এটা নিজেরই অবাক লাগে সুনন্দের।এখন তার একটাই প্রার্থনা বেঁধে বেঁধে রেখো ওদের,কোনোভাবেই যেন ওরা আগের মত হারিয়ে না যায়।

গল্প

পুত্তলিকা



তুহিনা দাস

(১)

পৌষর অন্তিমলগ্নে দুপুরান্তের আর্দ্র রোদে খোলা উঠোনে বসে চাল থেকে কাঁকর আলাদা করছিল অনুজা। তার সাত বছরের ছেলে কুট্টু উঠোনে একধারে মাটির ঢিবি বানিয়ে তার উপর নানা রকমের নুড়ি দিয়ে কী যেন সাজিয়ে চলেছে আপন মনে। এমন সময় বাড়ির সম্মুখে একটি পুকুরের অপর প্রান্ত দিয়ে একটা অটো-রিক্সা মাইকে কিছু একটা বলতে বলতে এগিয়ে চলেছে। কুট্টু খেলা ফেলে ছুটে গেল সম্মুখে পুকুরপাড়ে। অনুজা একটু এগিয়ে গেল। আগামী সপ্তাহ থেকে কুট্টুদের মফস্বলের এক পাড়ায় তালবনী মাঠ জুড়ে পৌষমেলা বসবে। একসপ্তাহ ধরে চলবে এই মেলা। তাই মাইকের মাধ্যমে আহ্বান জানাচ্ছে --- মেলা প্রাঙ্গণে সকলকে যোগদানের জন্য। কুট্টু মায়ের কাছে এসে কচি দু-হাত দিয়ে মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে বলল -- "যাবে তো মা- বলো না; নিয়ে যাবে তো? "- তার মা জানালো-- "সে পরে দ্যাখা যাবে ক্ষণ "। ইচ্ছা পূরণের ক্ষীণ আশায় কুট্টুর অশান্ত মন কিছুটা স্বস্তি পেল।

(২)

অনুজাদের নিজস্ব একটা দোকান আছে মফস্বলের হাটে। অনুজা ও তার স্বামী নিখিল দুজনেই পরিশ্রম করে তিলে তিলে গড়ে তুলেছে তাদের এই ব্যবসা। কচুরি, নিমকি, জিলিপি, মালপোয়া প্রভৃতি বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। সকাল ন'টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত তাদের দোকানের কাজেই ব্যস্ত থাকে অনুজা। তারা নিজেরা ছাড়া দোকানে একজন কারিগরও আছে । সন্ধ্যার দিকে নিখিল দোকানে যায় কিন্তু অনুজা আর যায় না। বাড়িতে রুটি, সবজি অর্থাৎ রাতের খাবার বানায় যা তার থেকে প্রতিবেশী কয়েকটি বাড়ির লোক ও অন্যান্য প্রতিবেশী পাড়ার কিছুজন লোক প্রত্যহ কিনে নিয়ে যায়। এটা অনুজার একার নিজস্ব ছোটোখাটো একটি ব্যবসা। প্রায় পাঁচবছর ধরে অনুজা এই ব্যবসার সাথে যুক্ত আছে। কুট্টুর স্কুলের নাম রোহন দাস। সে ক্লাস ওয়ানে পড়ে। ছবি আঁকা ও হাতের কাজে তার যথেষ্ট আগ্রহ আছে বলে আঁকার স্কুলেও ভর্তি হয়েছে সে। কুট্টুকে নিয়ে সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে কেটে যায় অনুজা ও নিখিলের সাংসারিক জীবনযাত্রা।

যথাসময়ে মেলার সপ্তাহ আসন্ন হলে একদিন কুট্টু তার বাবার সাথে সন্ধ্যাবেলায় মেলা প্রাঙ্গণে গিয়ে হাজির হয়। রঙবেরঙের কাপড় দিয়ে ঘেরা দোকানগুলো সে ঘুরে ঘুরে দুচোখ ভরে দেখতে লাগলো। ওদের মফস্বলে প্রায়ই মেলা বসে। কিন্তু তালবনী মাঠের এই মেলাটা অনেকদিন ব্যাপী হয়। মাঠটি আয়তন বেশ বড়ো হওয়ায় সারা মাঠজুড়ে মেলা বসে। নানারকমের দোকান বসেছে। কুট্টু ঘুরে ঘুরে তার পছন্দসই কিছু খেলনা কিনে নিল। এরপর কুট্টুর চোখ পড়ে তীরন্দাজি খেলার দিকে, যথারীতি সেও সামিল হয়। ওর অনেকদিনের ইচ্ছা ছিলো খেলনা হেলিকপ্টার কেনার, সে ইচ্ছা তার বাবা সেদিন পূরণ করে দিল। কুট্টু বাবাকে জিজ্ঞেস করলো--- "বাবা তুমি কিছু কিনবে না? " নিখিল বললো--- "কিনবো তো চল্"। নিখিল মেলা থেকে দুটো হাতপাখা কিনল। এবার কুট্টু ও নিখিল মেলায় খাবারের স্টলে গিয়ে হাজির হলো। জিলিপি, শরভাজা, মোরব্বা প্রভৃতি খাবার খেয়ে মায়ের জন্যও সেগুলো একটু করে নিয়ে নিল। তালবনী মাঠের অপর একবারে কিছু দোলনা বসেছে। কুট্টু নাগরদোলায় চড়বে বলে ইচ্ছা প্রকাশ করলে নিখিল জানালো যে নাগরদোলায় উঠলে তার মাথা ঘোরে তাই সে উঠবে না আর কুট্টু ছোটো বলে একা উঠতেও দেবে না। তাই ঘোড়ার দোলায় চড়াল। কুট্টু মেলার আনন্দ উপভোগ করে বাড়ি ফেরার সময় বাবাকে জানালো যে সে মায়ের জন্য কিছু নিয়ে যেতে চায়। নিখিল জানালো যে সে দূর থেকে দেখে রেখেছে যে সে মেলা থেকে কী নিয়ে যাবে। কুট্টুকে নিয়ে সে স্থানেই উপস্থিত হল। মেলার একধারে মাটিতেও নানারকমের কিছু দোকান বসেছে। এক জায়গায় বছর কুড়ি- একুশের এক যুবক মাটির তৈরি কিছু কিছু সামগ্রী নিয়ে বসেছে। তার মধ্যে মাটির পুতুলও আছে। পুতুলগুলি দেখতে ভারী সুন্দর। মাটি দিয়ে তৈরি বুড়ো-বুড়ি আছে, আছে নতুন কনে বৌ ও বর। আবার এক মাসি আনাজ বিক্রি করছে এমন দৃশ্যও মাটি ও অন্যান্য কিছু সামগ্রী দিয়ে সুন্দরভাবে তৈরি করা আছে। আর আছে মাটি দিয়ে তৈরি নানারকমের রং করা পাখি, মাটির ঘর ও আরও অন্যান্য জিনিস। মাটির ফুলদানীর গায়ে নকশা নিখিলের ভীষণ পছন্দ হলো। হাতে তৈরি নিখুঁত শিল্পকলা দেখে নিখিল ও কুট্টু অবাক হয়ে গেল। কুট্টু তার মধ্যে থেকে কয়েকটি পুতুল ও পাখি কিনে নিয়ে গেল আর নিখিল কাগজের ফুলসমেত একটি ফুলদানী নিয়ে গেল অনুজার জন্য।

অনুজা রাতের রান্না সেরে ঘরের কিছু কাজ করছিল, এমন সময় কুট্টু এসে মায়ের কাছে মেলার বিবরণ দিতে দিতে মেলা থেকে নিয়ে আসা সামগ্রী একের পর দেখাতে লাগলো। এক সময় সে মা কে বললো চোখ বন্ধ করতে ; ছেলের কথামতো কাজ করতেই অনুজার দুহাতে মাটির দুটো তুলে পুতুল দিল। অনুজা চোখ খুলে পুতুলগুলোকে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগলো, তার মুখে কৌতূহলপূর্ণ এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। কুট্টু মা-কে জিজ্ঞাসা করলো-- "মা তোমার পছন্দ হয়েছে তো? আরও কয়েকটা এনেছি দ্যাখো"।--- অনুজা নির্বাক হয়ে হাতের পুতুলগুলো রেখে বাকি সামগ্রীগুলোও হাতে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। অনুজা যেন অনেকদিনের হারানো জিনিস পুনরায় খুঁজে পেয়েছে...; এমনই ভাব তার মধ্যে ফুটে উঠেছে। কিছুক্ষণ পরে কুট্টু আবার তার মায়ের কাছে জানতে চাইলো-- "মা বললে না তো তোমার পছন্দ হয়েছে কি-না"। অনুজা দুটো পুতুল বুকে আঁকরে ধরে এক হাতে কুট্টুর গালে আলতো ছোঁয়া দিয়ে বলল--- "হ্যাঁ বাছা খুব...."। তারপর কুট্টু যথারীতি মেলা সম্পর্কে আরও বিবরণ দিতে লাগলো। পরেরদিন সকালে অনুজা জানিয়ে দিলো বিকেলবেলায় সে কুট্টুকে নিয়ে মেলাপ্রাঙ্গনে যাবে। আবারও মেলায় যাওয়া হবে শুনে কুট্টুর মন অনাবিল আনন্দে ভরে উঠল। দুপুর আসন্ন হলে কুট্টু অপেক্ষার প্রহর গুনতে লাগলো। ঘরে বসে নিজের মনে খেলছে আর ভাবছে কখন আসবে সে মাহেন্দ্রক্ষণ। দুপুরবেলা অবসরে উঠোনে বসে নিখিলের শার্টের ছিন্ন হয়ে যাওয়া বোতাম সেলাই করার সময় অনুজা মনে ফিরে যায় পুরোনো স্মৃতির নীড়ে..।

(৪)

দেবনগর গ্রামে অনুজার বাপের বাড়ি। অনুজার বাবা কুমোর মোহনচাঁদ মিত্র হলেন অসাধারণ মৃৎশিল্পী। বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে অনুজা ও তার এক ভাইও আছে। অনুজাদের দারিদ্রের সংসারে প্রতিবেশী কণিকামাসী নানাভাবে সাহায্য করতেন। অনুজাকে কন্যাস্নেহে দেখতেন। মোহনচাঁদবাবুদের কয়েকটা বাড়ির পরেই একটি বাড়িতে কণিকামাসি ও তার স্বামী অরূপবাবু ভাড়া থাকতেন। গ্রামের হাটে ভাড়া নেওয়া দোকানঘরে মেসোর একটি মুদির দোকান ছিল। তাঁদের একমাত্র ছেলে দিল্লিতে কাজ করতেন। অনুজা এগারো বছর থেকেই কণিকামাসির পরিবারের সাথে পরিচিত ছিল। মাসির বাড়িতে তার অবাধ যাতায়াত ছিল

অনুজা যখন নবম শ্রেণীতে পড়াশোনা করতো তখন মাসির পেটে একটি অপারেশন হয়েছিল। অনুজা সে সময়ে মাসি-মেসোর সংসারের হাল ধরেছিল। যথাসম্ভব সেবা দিয়ে মাসিকে সুস্থ করে তুলেছিল। মাসিও কাছছাড়া করতেন না তাকে। সেসময় থেকে অবসরে অনুজা বিভিন্ন রকমের হাতের কাজ করত। মাসির বাড়িতে মাটি দিয়ে নানারকমের সামগ্রী বানিয়েছিল। পুতুল, পাখি, কাগজের ফুল আরও কত কী যা মাসি-মেসোর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বিছানায় বসে মাসি সেগুলো হাতে নেড়েচেড়ে দেখতেন আর বলতেন--- "যতদিন প্রাণ থাকবে আমি এগুলো যত্নে রাখবো।" অনুজা উৎসাহ পেয়ে আরও নানা সামগ্রী বানাতে সচেষ্ট হতো। একসময় কণিকামাসি ও অরূপমেসো মনস্থির করে নেয় যে তাঁরা অনুজাকেই তাঁদের বাড়ির গৃহলক্ষ্মী বানাবে। কিন্তু তাঁদের একমাত্র ছেলে বিনোদের কাছে এ প্রস্তাব প্রেরণ হলে বাবা -মায়ের থেকে পাওয়া প্রস্তাবে তিনি অসম্মতি জানান। কারণস্বরূপ বিনোদবাবু জানান যে তিনি এ জীবনে বিয়ে করতেই চান না। মাসি-মেসো অত্যন্ত দুঃখিত হন। ছেলের মতামত জানার আগেই তাঁরা অনুজা ও তার পরিবারকে নিজেদের পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিয়ে রাখেন। অনুজা তখন দ্বাদশ শ্রেণীতে উঠেছে ; তাই যথেষ্ট বোধও আছে। এমন আভাসে মাঝে-মধ্যে তার মুখ রাঙা হয়ে উঠত, আবার স্বল্প ভয়ও পেত। বিনোদকে অনুজা দাদাবাবু বলেই ডাকত। স্বল্প কয়েকবার সে বিনোদ দাদাবাবুকে দেখেছে। যদিও বিনোদ খুব কম কথা বলে তবুও প্রয়োজনসূত্রে কথাও হয়েছে তাদের মধ্যে, তাতে বিনোদকে তার রাগী বলেই মনে হয়েছে। নানা দোলাচলের মধ্যেও কিশোরীমনে কখন যেন বিনোদবাবুর রাগী সত্তার আড়াল ভেদ করে শান্ত স্নিগ্ধ ছবিটি মনের স্তরখানি অধিকার করে নিয়েছিল। বিনোদ সম্পর্কে অধিক তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল কণিকা মাসির কাছ থেকেই। কখনওবা গল্পছলে আবার কখনও বা কথা প্রসঙ্গে উঠে আসা বিনোদের কথা শুনে তাঁর সম্পর্কে অনুজার মনে অস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়েছিল। তাই বিনোদের বিয়েতে অসম্মতি প্রকাশে অনুজা কিশোরী মনে তীব্র আঘাত লেগেছিল। কিন্তু তা কখনও কাউকে বুঝতে দেয়নি অনুজা। শত ব্যস্ততার মাঝেও শুকনো হয়ে যাওয়া অনুজার মুখ মাসি- মেসোর চোখ এড়িয়ে যায়নি। মাসিও আড়ালে চোখের জল ফেলতে থাকে যা অনুজার লক্ষিত হয়। পুনরায় মেসো ছেলের কাছে বিয়েতে অসম্মতি

প্রকাশের নির্দিষ্ট কারণ জানতে চাইলে বিনোদবাবু স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে তিনি এ জীবনে বিবাহ করবেন না আর এ বিষয়ে কারণ ব্যাখ্যা করাও তিনি জরুরি বলে মনে করেন না। এরপর মাসি-মেসো এ বিষয় নিয়ে আর বিশেষ কিছু ভাবা সমীচীন মনে করেননি। কিছুদিন পর মেসোর চোখের অপারেশন হয়, সেসময় অনুজা যথাসাধ্য মেসোর দেখাশোনা করেছে; এমনকি মাঝেমধ্যে গ্রামের হাটে গিয়ে মেসোর দোকানও সামাল দিয়েছে। এরপরে অনুজার দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর অনুজার বাড়ি থেকে বিয়ের জন্য দেখাশোনা শুরু করেন। বেশ কিছুদিন পরে যথাসময়ে নিখিলের সাথে অনুজা বিবাহ দিয়ে দেন। তার বিয়ের অনেকদিন আগেই মাসি-মেসো সেই ভাড়াবাড়ি ছেড়ে অন্যগ্রামে চলে যান। সেখানে কণিকামাসিরা নিজস্ব বাড়ি গড়েছেন আর অরূপমেসোর বাড়িসংলগ্ন মুদির দোকানও হয়েছে।

(৫)

সন্ধ্যাবেলায় অনুজা কুট্টুর সাথে মেলায় গিয়ে মেলা পরিদর্শনকালে মাটির পুতুল বিক্রেতা ছেলেটার সাথে দ্যাখা করে যা কিছু সামগ্রী বিক্রি হয়ে গেছে সেগুলো ছাড়া বিক্রেতার কাছে অবশিষ্ট যা কিছু ছিল সকল সামগ্রী কিনে নিতে চাইলে বিক্রেতা একটু অবাক হয়ে গেলেও খুশি মনে সব বিক্রি করে দিল। এরপর অনুজা ছেলেটির পরিচয় জানতে চাইলে সে জানালো তার নাম বিল্টু, পেশায় ঢাকী। তারপর বিল্টু নিজের গ্রামের পরিচয় দিলে অনুজার মনে পড়ে যায় বর্তমানে সেই গ্রামেই কণিকামাসিরা থাকেন। অনুজা মাসি-মেসোর নাম করে নিজেকে কণিকামাসিদের পরিচিত বলে জানিয়ে বিল্টুর কাছ থেকে তাঁদের খবর জানতে চাইলে সে জানায়--- " আমি কণিদিদাদের পাশের বাড়িতেই থাকি। কণিদিদার গলব্লাডার অপারেশন হয়েছে, দাদুও বিশেষ ভালো নেই। আর মামার অর্থাৎ তাঁদের একমাত্র ছেলে অনেকদিন ধরে ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত শুনে দাদু-দিদা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন।" এক নিমেষে অনুজার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল। তাদের কথোপকথনের সময় কুট্টু মেলায় কাছাকাছি দোকানগুলোতে ঘুরে ঘুরে পছন্দসই জিনিস কিনছিল। মেলায় আসবে বলে তার বাবা তাকে দুশো

টাকা দিয়েছিল, তাই সে ইচ্ছেমতো সামগ্রী কেনায় মন দিয়েছে। কথা প্রসঙ্গে অনুজা জানতে পারে মেসোর দোকান খুব একটা ভালো চলেনা, অসুস্থতার কারণে বিনোদবাবুও এখন আগের চাকরি করছেন না। বর্তমানে বাড়িতে থেকেই দোকান দ্যাখাশোনা করেন। তবে নিকটবর্তী স্থানে চাকরির চেষ্টা করছেন। বিল্টু একথাও জানায় যে কণিদিদাদের তিনজনের ওষুধের খরচ অধিক হওয়ায় তাঁরা এখন একটু অনটনের মধ্য দিয়েই যাচ্ছেন। তালবনী মাঠে মেলা হবে জানতে পেরে কণিদিদা নিজেই এই মাটির সামগ্রী তার হাতে তুলে দিয়েছে। অনুজা মনে মনে ভাবতে লাগলো মাসিদের সত্যিই ভীষণ অর্থের দরকার নাহলে তাঁর প্রিয় সামগ্রীগুলো কখনই.....। অনুজা বিল্টুকে জানায় কণিকামাসিরা তার পরিচিত হওয়ায় সে জানে মাসির ঘরে কোনো না কোনো স্থানে একটি কাঠের বাক্স আছে, তাতেও অনেক মাটির তৈরী করা সামগ্রী থাকতো। যদি সেগুলো এখনো থেকে থাকে, অথবা বিক্রি না হয়ে থাকে তাহলে অনুজা সবটুকুই কিনে নিতে চায়। বিল্টু বললো এ সম্পর্কে সে আর কিছু জানে না, তবে যদি আর কিছু থেকে থাকে তা বিক্রির জন্য কণিকা মাসিকে অনুরোধ জানাবে। আর অনুজা বিল্টুর কাছে অনুরোধ রাখলো বিল্টু তার ভায়ের মতো তাই তাদের ভাইবোনের মধ্যে হওয়া কথোপকথন মাসি-মেসোকে না জানাতে। বিল্টুও সম্মতি জানালো অনুজার কথায়।

(৬)

পরেরদিন অনুজা কুট্টুকে নিয়ে পুনরায় মেলায় গিয়ে কিছুটা ঘোরাঘুরি করে অন্যান্য দোকান থেকে কয়েকটা জিনিস কিনে বিল্টুর কাছ থেকে তার নিয়ে আসা সমস্ত জিনিস কিনে নিল। আর বিল্টু একথা জানিয়ে দিল যে দিদা জানিয়েছেন যা ছিল তা সবই দিয়ে দিয়েছেন; আর কিছু এরকম সামগ্রী তাঁর কাছে নেই। দুদিন ধরে কুড়ি হাজার টাকার বিনিময়ে সমগ্র সামগ্রী অনুজা কিনে নিল। ধার্যমুল্যের অধিক টাকা দিয়ে অনুজা জিনিস কিনে নেওয়ায় প্রথমে বিল্টু একটু অবাক হলেও পরে সে ভাবে কণিদিদারা ক্রেতা দিদির পরিচিত, তাই তাঁদের সমস্যার কথা শুনেই হয়তো...। বিল্টু প্রথমে ধার্যমুল্যের অধিক টাকা নিতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত অনুজার কথা ফেলতে অক্ষম হয়।

(৭)

অনুজা ও কুট্টু মনের আনন্দে ঘরের শোকেস সাজাতে থাকে মেলা থেকে নিয়ে আসা নতুন সামগ্রী দিয়ে। জিনিসগুলো সাজানোর সময় অনুজা মনে ভাবছে নিজের হাতে তৈরি করা জিনিস তাকে এভাবে কিনে নিতে তা কখনো আগে ভাবনায় আসে নে। মাসি-মেসো যদি একথা কখনো বা জানতে পারে যে মাটির পুতুলগুলির ক্রেতা স্বয়ং অনুজা-- তাঁরা নিজমনে কষ্ট পাবেন। এতদিন পরে অনুজা উপলব্ধি করতে পেরেছে সেদিন বিনোদবাবুর তাকে বিবাহ না করার কারণ। বিনোদ দাদাবাবুর প্রতি অনুজার মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। অনুজার নিজস্ব ব্যবসা থেকে আয় করা টাকা সংসারে সাধারণত লাগে না। তবে প্রয়োজনে অনুজা সাহায্য করে। এছাড়া সে সেই টাকা জমিয়ে ঘরের অনেক আসবাবপত্রের জিনিস কিনেছে। মেলা থেকে নিয়ে আসা প্রতিটি জিনিস অনুজা নিজের পয়সায় কিনেছে। কণিকামাসি তাকে মেয়ের মতোই ভালোবাসতো তাই তাঁদের বিপদের দিনে ন্যূনতম সাহায্য করতে পেরেছে--- একথা ভেবে অনুজা মনে শান্তি লাভ করলো।

(৮)

বেশ কিছুদিন পর নিখিল অনুজাকে বললো-- "অনুজা কণিকা মাসির সাথে দ্যাখা করতে যাবে? " অনুজা বিস্মৃতির চোখে জিজ্ঞাসা করলো "তুমি তাঁদের চিনলে কীভাবে!" নিখিল বললো-- "আমার স্ত্রীর আত্মীয়তা তো আমারও আত্মীয়। তাঁদের চিনে নেওয়াটা আমার কর্তব্য বলেই মনে করি।" অনুজা নির্বাক হয়ে নাগালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। নিখিল জানালো- মেলা কমিটির থেকে সন্ধান নিয়ে সে বিল্টুদের গ্রামে গিয়েছিল। আর ইতিমধ্যে দেবনগর গ্রামেও সে অনুজার বাবা-মায়ের কাছে গিয়েছিল। এভাবেই সে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে। আর সে জানালো তার স্ত্রী যে মৃৎশিল্পী এটা জানতে পেরে নিখিল ভীষণ খুশি হয়েছে। অনুজা নিখিলকে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে নিখিল অনুজাকে জানায় অনুজা যেন যথাসাধ্য কণিকা মাসিদের সাহায্য করে; আর প্রয়োজনে নিখিল নিজে তাকে সাহায্য করবে। পরবর্তীতে নিখিল ও অনুজা ঠিক করে জীবনপথে তারা মানুষের দুর্দিনে তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে।

স্মৃতিকথা



লাজবী মুখার্জী

ছোটবেলাটা ছিল কম চাহিদাপূর্ণ তবে অনুভূতিহীন নয়। সব চাহিদাকে ঘিরে থাকত একটা অপেক্ষা। হয়তো বাবা মা চাইলেই দিতে পারতেন আমার আকাঙ্খিত জিনিসটা তবে সহজে দিয়ে সেটাকে সহজলভ্য করে দিতেন না পাছে অভ্যাসটা খারাপ হয়ে যায়! এখন বর্ষাকালের দিনে সেই অর্থে কোনো অনুভূতির সৃষ্টি হয়না। সভ্যতা বড় যান্ত্রিক সঙ্গে আবেগও।

ছোটবেলায় বর্ষার দিনগুলোতে মন কেমন করতো একটু বৃষ্টির জলে স্নাত হবার গভীর ইচ্ছায় তবে মায়ের বকুনির ভয়ে আমার বর্ষা মুখ লুকাতো রেনকোর্টের অভ্যন্তরে। তবে কখনো কখনো স্কুল থেকে ফেরার পথে বাসের জানলার বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করে নিতাম একটা, দুটো করে হাজার বৃষ্টির ফোঁটাকে, ওরা অন্তরকে স্নাত করতো। আবার কখনো এমনও হয়েছে যখন স্কুল থেকে বাসে ওঠার পথেই আমার ইচ্ছেকে সম্মান জানিয়ে প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে আমার শিশু, মন প্রাণে। খুব আনন্দ পেতাম তখন, ঠাণ্ডা লাগার ভয় মনকে গ্রাস করতো না। একটু চেষ্টা করলে হয়তো আটকাতে পারতাম নিজেকে ভেজার থেকে তবে মন সায় দেয়নি নিজেকে আটকাতে। বৃষ্টির সঙ্গে মিশে যাবার ইচ্ছেটা তখন প্রবল হয়ে যেত। বাড়ি ফিরে হয়তো মায়ের বকুনির ভয়ে বা নিজের পিঠ বাঁচাতে হঠাৎ করে ভিজে গেছি এমন আজগুবি মিথ্যে গল্প শুনিয়ে দিতাম তবে সেই মিথ্যের মধ্যে ছিল নিষ্পাপ মনের চাপা আবেগ তাই সব বুঝেও মা পরম স্নেহে গামছায় মাথা মুছিয়ে দিয়ে কোথাও ভালোবাসার পরশ বুলিয়ে দিত।

কাগজের নৌকা বানানোর অদম্য চেষ্টা ছিল তবে কোনোদিনই সেটা ঠিক নৌকার আকার নিতনা। অবশেষে, আমার আকারহীন বস্তুটিকে সযত্নে আগলে বাবা দিতেন নৌকার আকার। সেই কাগজের নৌকায় যেন ভেসে চলতো আমার শিশুমনের আবেগ।

এখনও প্রতি বছর রথযাত্রা আসে, রথযাত্রা যায় শুধু সেখানে ছোটবেলার আনন্দকে দুমুঠোতে ধরতে পারি না। ছোটবেলায় রথযাত্রা এলে তিনতলা রথ চালানোর খুব ইচ্ছে হতো, হয়তো বায়নাও করেছি কখনো! তবে, বাড়ির সবাই ছোট একটা রথকে এত সুন্দর সাজিয়ে উপহার দিতেন যে মনেই থাকতো না আমার একটা বড়ো রথ দরকার ছিল।স্বল্প প্রাপ্তিতে সুখ ছিল, আনন্দ ছিল। তখন থেকেই বোধহয় স্বল্পকে বৃহৎ রূপে গ্রহণ করার ক্ষমতা একটু একটু করে গড়ে উঠেছিল। রথের দিনে মা দূর্গার কাঠামো পূজার কথা ভাবলে খুব অবাক লাগতো কারণ ভাবতেই পারতাম না মা শুধু খড়, মাটিতে নির্মিত এক মূর্তি, মাকে তো আমি খুঁজে পেতাম শরৎ মেঘের ভেলায়, আমার মন খারাপের রাতে- যার আঁচল আমার সবথেকে নিকটতম আশ্রয় হয়ে উঠতো। সেই মাকে নির্মাণ করতে হয় এটা ভাবতে খুব কষ্ট হতো কারণ সে যে আমার অন্তরের গভীরে সবসময় চুপটি করে বসে থাকতো।

এরপর যখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবার দিকে তখন ঘড়ির কাঁটা মেনে শুধুই সময়ের অপেক্ষা! ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজতে না বাজতে মন যেন রথের রশিতে টান দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতো। ফুল, পাতার সাজে আমার সামান্য রথটা এমন অসাধারণ হয়ে উঠতো যাকে নিয়ে আমার গর্বিত শিশু মন অবাধ কল্পনার জাল বুনে ভাবতো- এই তো সেই আমার ইচ্ছে উড়ান যাকে নিয়ে ইচ্ছে করলেই যেন আমি দূরে, বহুদূরে পাড়ি দিতে পারি। অনেক বড়োরা এসে রথের রশিতে টান দিত। হয়তো, এমন ভাবেই তারাও তাদের ছোটবেলাকে ছুঁয়ে দেখতে চাইতো যেমন ভাবে আজ আমি ছুঁতে চাইছি।

বিকেলের আলো মুছে ক্ষীণ হয়ে যখন অন্ধকার নেমে আসতো তখন আমার আনন্দের পরিমাণটা একগুণ থেকে দশগুণে পরিণত হতো কারণ রথের মেলায় যাওয়া, জিলিপি, পাঁপড়ের সেই উষ্ণ অভ্যর্থনার মধ্যে কোথাও আনন্দের সাথে আবেগ মিশে একাকার হয়ে যেত। বাবা, মার হাত ধরে রথের মেলায় যাওয়া,

জিলিপি, পাঁপড়ের সেই উষ্ণ অভ্যর্থনার মধ্যে কোথাও আনন্দের সাথে আবেগ মিশে একাকার হয়ে যেত। বাবা, মার হাত ধরে রথের মেলায় যাওয়া, কাঠের পুতুল, মাটির পুতুল,তার সঙ্গেও প্রায় দুব্যাগ ভর্তি খেলনা কিনে আনার মধ্যে ছিল এক স্বর্গীয় অনুভূতি। সারাদিন এত উচ্ছাসের পরেও কখনো ক্লান্ত বোধ হতোনা কারণ তখনও বাস্তবতা এসে জানলায় কড়া নেড়ে মনকে বড়ো হতে দেয়নি। ছোট ছোট আনন্দ গুলোই যেন প্রতিদিন অক্সিজেনের জোগান দিত।।

"শারদীয়ার আগমনে মাতল রে ভুবন
আকাশ আঙিনাতে আঁকে শুভ্র আলিপন
কাশের গুচ্ছ চামর দোলায়-
ভরা নদী সুরের বন্দনা গায়
শিউলি করে ভক্তি ভরে অর্ঘ্য নিবেদন"

আকাশ জুড়ে মেঘের মলাট, শুভ্রকাশের গভীরে লুকিয়ে ছোট্ট মেয়ের ছোট্ট মনের আবেগ, শিউলির মন মাতানো গন্ধে প্রতিটি সকালের জেগে ওঠা, পেঁজা তুলোর মতো মেঘের সারিতে মা দূর্গার ভালোবাসায় মোড়া মুখটাকে খুঁজে নেবার অসীম আগ্রহ এই সকল অনুভূতির ভেলায় ভেসে চলতো আমার ছোটবেলা। শরৎকাল বরাবরই আমার ভীষণ প্রিয় তাই ছোট বয়স থেকেই মনে হতো ঋতুচক্রের চাকাটা যদি নিজের হাতে ঘুরিয়ে দিয়ে বারবার শরৎকালকে ফিরিয়ে আনা যেত তবে বোধহয় আমার মত সুখী কেউ হতোনা!
মাস দুয়েক আগে থেকে পুজো আসার অপেক্ষায় প্রহর গুণতাম। বাড়ির সামনের একটা শিউলি গাছ এইসময় ফুলে ভরে যেত। অনেক ফুল মাটিতে পড়ে থাকতো, লুটিয়ে পড়ে থাকা এই ফুলগুলোকে দেখে ভারী কষ্ট হতো তাই যাতে ওরা পদপিষ্ট না হয় তাই সযত্নে ওদেরকে কুড়িয়ে মুঠো ভরে নিতাম। আকাশে রঙের খেলা দেখতে বেশ লাগতো তাই মনেও যেন মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াতো এই ভেলায় ভেসে যে কোথায় চলে যেতাম দূরে-

বহুদূরে,আর এই যাত্রার একমাত্র সঙ্গী হতো আমার প্রিয় কাগজ, কলম। লিখতাম শরৎ নিয়ে শিশু মনের আবেগের টুকরো কিছু কবিতা। কাশবন যেন আমাকে দূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকতো আর আমি কল্পনার খেয়ায় হাজারও কাশবনে প্রতিদিন ঘুরে বেড়াতাম।

পুজোর দিন এগিয়ে আসলেই বাবা, মায়ের হাত ধরে যেতাম পুজোর নিত্যনতুন জামা কিনতে। জামা দামী হোক বা সস্তা তাকে কখনো অর্থের দাঁড়িপাল্লায় মেপে দেখতাম না কারণ ভালোবাসার দাঁড়িপাল্লায় তার ওজন যে অনেক হতো! প্রাপ্তি ভাগ্যটা বেশ প্রসন্ন ছিল তাই আত্মীয় স্বজনের বাইরেও অনেক পরিচিত, বন্ধুবান্ধবের পরিবার থেকে পেতাম পুজোর উপহার। সেই উপহারে তাদের আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও স্নেহাশিসের ছোঁয়া অনুভব করতে পারতাম। হাতে বড়দের থেকে প্রাপ্ত দশ টাকাতে তাদের ভালোবাসার গন্ধ পেতাম।

অধীর অপেক্ষার পর আসতো সেই দিনটা যেদিন বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠের শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণে চোখ খুলে ভোরের শহরকে দেখতাম। অধিকাংশ শব্দের অর্থই বুঝতাম না তবে যখন বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের কন্ঠে দেবী আগমনের প্রাক্কালে আবেগঅশ্রু ঝরে পড়তো জানিনা কেন আমারও মনের ভেতরটা কেমন উত্তাল পাতাল হতো! বাবা, জেঠু, কাকুদের ছোটো থেকেই দেখতাম তর্পণ করতে যেতে। মায়ের চোখ আঁকার দৃশ্যটা বড়ো দেখতে ইচ্ছে করতো! টিভির পর্দায় ডি ডি বাংলায় মহালয়া দেখে শিহরিত হতাম আর ভাবতাম আমার অন্তরে যে সহজ, সুন্দর মা ঘুমিয়ে আছেন এই মা কি সেই মা! পুজো আসার সাতদিন আগে থেকেই নির্বাচন করে রাখতাম কোন দিন কোনটা পড়বো।

পুজোর দিনের সংখ্যা পাঁচটি হলেও প্রসন্ন ভাগ্যের দরুণ কপালে জুটতো একাধিক জামা। পঞ্চমীর দিন রঙিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে স্কুলে যেতাম, সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে স্কুলে ছুটি পড়ে যেত! ঢাকের আওয়াজে যখন চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠতো কী যে ভালো লাগতো! যেন মনে হতো স্বর্গ মাটিতে নেমে এসেছে। পূজাবার্ষিকীর আনন্দমেলা ছিল আমার পুজোর সকালগুলোতে

অবসর যাপনের সঙ্গী। এরপর সন্ধ্যা হলেই নতুন জামা কাপড়ে সজ্জিত হয়ে বাবা, মায়ের হাত ধরে আলোকময় কলকাতার পথে প্রান্তরে যেন হারিয়ে যেতাম। পায়ে হেঁটে ঠাকুর দেখাতে ছিল এক অদ্ভুত স্বর্গীয় অনুভূতি। ফুচকা, ঝালমুড়ি খাওয়াতে ছিল প্রচন্ড আনন্দ ও আগ্রহ। বাড়ির কাছাকাছি বেলগাছিয়া মাঠের মেলায় ছিল মাটির ও পুতুল কেনার একটা ভীষণ রকম হুজুগ! ঠাকুর পরিদর্শনে কোন ক্লান্তি ছিলনা!

থিম পুজোর পুতুল মায়ের থেকে সাবেকি মা আমাকে ভীষণ আকর্ষণ করতো। দুচোখ ভরে দেখতাম মায়ের টানা টানা দুটো চোখের দিকে। এরপর পুজোর তিনদিন অতিক্রান্ত হবার পর আসতো সবথেকে প্রিয় দিনটা অর্থাৎ অষ্টমীর দিন। পাড়ার প্যান্ডেলে প্রায় ধাক্কাধাক্কি করে অঞ্জলী দেওয়াতে ছিলনা কোন প্রতিযোগিতা বরং ছিল এক বিশেষ অনুভূতি। অষ্টমীর ভোগ খাওয়াতে যেন অদ্ভুত তৃপ্তি অনুভব করতাম, স্বল্পতেই যেন খিদে মিটে যেত! সন্ধিপুজোয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে মায়ের কাছে শুভবুদ্ধি, শুভচেতনা প্রাপ্তি প্রার্থনা করতাম।

এইসব কিছুর পর আসতো আমার সবথেকে মন খারাপের দিনটি অর্থাৎ বিজয়া দশমী। এই দিনটি আসলেই আমার ভীষণ কষ্ট হতো, মনে অভিমানের কালো মেঘ জমতো, মাকে জড়িয়ে ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করতো যা আজও করে। বিসর্জনের সেই ধ্বনি আমাকে বড্ড যন্ত্রণা দিত যা আজও দেয়। মাকে কেন নিজের কাছে বেঁধে রাখতে পারিনা মনে প্রশ্ন জাগতো!

বিজয়া দশমীতে বড়োদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম আর পরিবর্তে পেতাম নারকেলের নাড়ু, ঘুগনি, গোলাপজাম, রসগোল্লা আর তাদের আন্তরিক শুভকামনা।

আজও দুর্গাপুজো আসে, খুব ভালো লাগে এই সময়টা তবে ওই যে ধরতে পারি না ছোটবেলাটাকে, ছোটো ছোটো আনন্দগুলোকে কারণ বাস্তব যে বড্ড রুক্ষ সে যে মনকে ছোটো থাকতে দেয়না তাই বাস্তবের খেয়া ঘাটেই বাঁধি স্মৃতির তরণী।।

শহর যেন মুখ ঢাকতো কুয়াশার চাদরে, ঘাসগুলো যেন হালকা শিশিরে নিজেদের শরীর ভিজিয়ে নিত, আর আমি যেন নরম লেপের সঙ্গে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হতাম। আজও এইভাবেই শীতের হাত ধরে আমার অনুভূতির গভীরে ঘুমিয়ে আছে আমার ছোটবেলা।

ভোরবেলা পাঁচটার অ্যালার্মে ঘুম ভাঙিয়ে স্কুলে যাওয়া ছিল আমার কাছে কিছুটা হলেও বিরক্তিকর। শীতের নরম লেপ মুড়ি থেকে বেরিয়ে মন ও শরীর দুটোই খালি আড়মোড়া ভাঙতো, আমার এই আলস্যর সঙ্গী হয়ে ভোরের সূর্যও যেন মিষ্টি হাসি হেসে আমার মতো আড়মোড়া ভাঙতো! ঘুম থেকে উঠে অত সকালে স্কুলে যেতে ইচ্ছে না করলেও বাড়ির বাইরে বেরিয়ে ভোরের নির্মল বাতাস যেন মনে হতো পুরো শহরের ভালোবাসা ছড়িয়ে আছে আর আমি যেন প্রাণভরে তার গন্ধ নিতাম। খালি পায়ে শিশির ভেজা ঘাসের ওপর হাঁটতে ভীষণ ইচ্ছে হতো তবে ঠান্ডা লেগে যাবার আপদ বালাইয়ের জন্য মা চিরকাল মুড়ে রাখতো যত্নের চাদরে তাই সোয়েটার পুরো শীতটা আমাকে জড়িয়ে থাকতো। স্কুলবাসের বদ্ধ কাঁচ দিয়েই তাই দেখতাম শীতের তিলোত্তমাকে। চলতি পথে চোখে পড়তো পাড়ার মোড়ে চায়ের দোকানে বসে থাকা মানুষদের ভাঁড়ের কাপে চায়ে সুখের চুমুক দিতে, আমার বেশ লাগতো এই দৃশ্যগুলো দেখতে। শীতের রোদ গায়ে মেখে নেবার মধ্যেও ছিল এক অদ্ভুত পরিতৃপ্তি তাই আমার শিশুমন শীতের এই রোদ গায়ে মেখে নিয়ে ভরে উঠতো এক অদ্ভুত স্বর্গীয় উজ্জ্বলতায়।

শীতের ক্লান্ত, অলস দুপুর গুলোতে আমার লেপ, কম্বল ছাড়াও সবথেকে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হিসেবে মায়ের নরম হাতের ছোঁয়া, মায়ের আঁচল ভীষণ প্রয়োজনীয় ছিল।

শীত আমার আর একটা ভীষণ প্রিয় ঋতু তাই তাকে মনে প্রাণে উপভোগ করতে চাইতাম। এইসময় জেঠু বাজার থেকে আমার পছন্দের প্রচুর শীতের ফুল আনতো আমি যেন তাদের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ বোধ করতাম। ঠান্ডাটা একটু বেশী পড়লেই যে মনের মধ্যে কী আনন্দ হতো তবে, ঠান্ডা লাগার এই আপদ

বালাইয়ের জন্য মাঝে মাঝে একটু নিজেকে উষ্ণতা দেওয়ারও প্রয়োজন হতো তখন বাড়ির সবার সাথে বসে আগুনের উত্তাপের পরশ বুলিয়ে নিতাম নিজের মনেপ্রাণে। এখনও মনে পড়ে যায়, শীতকাল এলেই বাবা, মার হাত ধরে ট্রেনে চেপে পৌঁছে যেতাম মাসিদের বাড়ি। গ্রাম্য পরিবেশে শীতকে যেন প্রকৃতির রানী মনে হতো, প্রকৃতির স্নিগ্ধ, সুন্দর রূপে যেন আমি মোহিত হয়ে যেতাম। খেজুর গাছের রস নিঃস্বরণ, গোরুর দুধ নিঃস্বরণ, ছাগলছানাদের ছুটে বেড়ানো দেখার জন্য মনটা ছটফট করতো তাই মাসির বাড়ির নিকটস্থ গ্রামেগঞ্জে ঘুরে দেখতাম সেইসব দৃশ্য আর চোখকে স্বার্থক করতাম। মাসির বাড়ি থেকে ফিরে আসার সময় খুব মনখারাপ লাগতো। ফিরে আসার সময় মাসি সাথে করে দিয়ে দিত হাঁসের ডিম, ঘি, বোতল ভর্তি খাঁটি গোরুর দুধ, খেঁজুর গুড় আরও কত কী! পৌষ পার্বণ এলেই মা সেই গুড় দিয়ে আর তার হাতের ভালোবাসা দিয়ে গড়তো পিঠে,পুলি। সেই পিঠে পুলির স্বাদ আমি আজও ভুলিনি।বড়দিনের দিনগুলো ছিল ভীষণ আনন্দময়, যীশু ভগবানকে অন্তরের সমস্ত ভালোবাসা যেন উজাড় করে দিতাম এই সময়। ক্রিসমাস ট্রি সাজাতাম রকমারি তারা, লাঠি, বল ইত্যাদির সমন্বয়ে। বড়দিনের সকালে ঘুম থেকে উঠে আগে বালিশ উল্টে যীশু ভগবানের দেওয়া ভালবাসাময় উপহার খুঁজতাম। সেই উপহার সস্তা বা দামী হোক, সেই উপহারকে সযত্নে বুকে জড়িয়ে শিশু মনের আবেগ অনুভব করতাম। জানুয়ারির মাঝামাঝি বা শেষের দিকটা এলেই বাবার হাত ধরে ছুটে যেতাম বইমেলায়। নতুন বইয়ের গন্ধে যেন নিজেকে নতুনভাবে অনুভব করতে পারতাম। ব্যাগ ভর্তি করে কিনে নিয়ে আসতাম নিজের পছন্দমত বই।

আজ সবই অতীত, আজকের দিনটা চলে গিয়ে আবার কাল নতুন একটা দিন এলেই আজকের দিনটা কালকের দিনের কাছে অতীত। এটাই হয়তো জীবনের নিয়ম। মন সব জানে, সব বোঝে তবুও যেন সে মানতে চায়না তাই অনুভূতির দেওয়ালে আপন খেয়ালে সে প্রতিদিনই লিখে চলে তার স্মৃতিকথা।।

"দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি"

মনের সর্বত্র অবাধ বিচরণ তাই সে সময় নির্ঘণ্টকে সহজেই হার মানিয়ে তার আপন গতিতে ভেসে চলে আর স্রোতের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায় আমাকেও স্মৃতির বিজনঘরে।
মনের ভেলায় ভাসতে ভাসতে পৌঁছে যাই স্মৃতির ভিন্ন প্রান্তরে আর পরশ পাই আমার ভালোলাগার, ভালোবাসার দিনগুলোর। আজও উচ্ছলিত হয়ে উঠি যখন সরস্বতী পূজার দিন বাসন্তী বা হলুদ শাড়িতে শাড়ির আঁচল, কুঁচি সামলাতে না পারা সেই ছোট্ট আমির মুখটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে স্মৃতির আয়নায়। বাড়িতে মহাসমারোহে বাগদেবীর আরাধনা হতো, উপোস করে অঞ্জলী দেবার মধ্যে ছিল এক পবিত্র আনন্দ। এই উপোস কোনোদিন শরীরকে কষ্ট দিওনা বরং অন্তরকে এক অদ্ভুত পরিতৃপ্তি দিত। লোকের ভিড়ে খুশির জোয়ারে যেন আনন্দ সাগরে ভেসে বেড়াতাম, স্কুলে যাবার সুযোগ খুব কম হতো তবে তাতে বিশেষ দুঃখ ছিলনা কারণ স্কুলের অনেক বন্ধুরা বাড়িতে আসতো। জীবনটা বাস্তবতা থেকে ছিল অনেক দূরে, অর্থের থেকে আবেগের মূল্য তখন অনেক বেশি ছিল।
এখনও নিঃশ্বাস যেন বিশ্বাসেই বাঁচে। তাই বিশ্বাস বলে মনের রঙ চিরন্তন। ছোটবেলাতেও এই বিশ্বাসটাই মনকে আশ্বাস দিত। ছোটবেলার দোলের দিনগুলো আমার বেশ লাগতো তবে রঙে ছিল ভীষণ ভয় তাই আমার শরীর মনের রঙে রঙিন হতো বরাবরই তবে আবির, ফুলের পাপড়ি এইগুলোতে বরাবর একটা ভালোলাগা অনুভব করতাম। টিভিতে শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠান দুচোখ ভরে দেখতাম মন যেন ছুটে পালাতে চাইতো তার অঙ্গনে। বাংলা নববর্ষের কথা ভাবলে   ভীষণ আবেগ অনুভব করতাম ছোটবেলায় যা আজও করি।
সব পুরোনোকে অন্তরের রুদ্ধদ্বারে গোপন রেখে নতুনকে স্বাগত জানানোর একটা ভীষণ শুভ ইচ্ছা মনকে অধিকার করেছিল ছোট বয়স থেকেই। সস্তা সেলের জামায় ছিল এক অপূর্ব স্বর্গীয় সুখ যা মনকে শান্তি, স্বস্তি, তৃপ্তি দিত।

প্রাণের ঠাকুরের জন্মদিনটা ছিল এক বিরাট উৎসব। তাকে এই বিশেষ দিনে শ্রদ্ধা জানাতে কখনো মঞ্চে সস্তার শাড়িতে সুধা সেজেছি তো কখনো বা চারুলতা! কখনো মুক্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠেছি তার গান তো কখনো আবার বিনা পারদর্শিতায় শুধুই প্রাণের রবিকে ভালোবেসে পায়ে বেঁধেছি ঘুঙুর। সস্তার খাবারের প্যাকেট অনেকে মিলে একসঙ্গে খেয়ে নিয়ে ভাগ করে নিয়েছি প্রাণের রবির জন্মদিনের আনন্দকে।

মন আজও হারিয়ে যেতে চায় আমার বাড়ির সামনের পার্কটাতে, আমার প্রিয় বিদ্যালয়ে। ছোটবেলায় মায়ের হাত ধরে অনেক ঘুরে বেরিয়েছি আমার চিরচেনা পার্কটাতে, ছোটো ছোটো খেলার মাধ্যমে জীবনের ছোটো ছোটো আনন্দগুলো এইভাবেই শরীরে, মনে দখল নিত। মন ছুঁটে যেতে চায় আমার প্রিয় বিদ্যালয়ের ড্রিলসেডটায় কারণ সে যে একাকী কাঁদে অসহায়। মনের ফ্রেমে ভিড় করে আসে আমার বিদ্যালয়ের সেই সমবেত হয়ে প্রার্থনা করার দিনগুলোর ছবি। তখনই চোখটা হঠাৎ করে ঝাপসা হয়ে আসে আর আমি যেন কোন একটা পথ খুঁজি যে পথে আবার ফিরে যাওয়া যায় আমার প্রিয় সেইসব পুরোনো ঠিকানায়। তবে, সময় যেন হাতে, পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেয়! ইচ্ছে হলেও ফিরতে পারিনা যে সেইসব পুরোনো রাস্তায়। তাই, মনের জানলা খুলে দিই আর প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিই আর স্মৃতির পাতা গুলোকে স্বযত্নে আগলে রেখে ডুব দিই মনপারের ওই ভাবসাগরে আর এভাবেই খুঁজি অরূপরতন।।

ছোটোবেলাটা যেন আজও তার আনন্দের ঝাঁপি নিয়ে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে কানে কানে বলে যায় সে আজও লুকিয়ে আছে বড়ো হবার ছোটো ছোটো খুশিগুলোর আড়ালে।

বাবা, জেঠু দুমুঠো ভর্তি খুশি ছড়িয়ে দিত কুমারটুলি থেকে ঝুলনের সময় রঙ বেরঙের মাটির পুতুল এনে দিয়ে। ঝুলন ছোটবেলার ছোট আনন্দগুলোর একটা বিশেষ অংশ জুড়ে আছে।

সবাই বলে বড্ড ব্যস্ত জীবন একমুহূর্ত অবসর নেই! আমার মনে হয়,
একটু আনন্দ আমরা সহজে যে কোনো বিষয় থেকে খুঁজে নিতে পারি। আসলে, জীবনটা বড়ই ক্ষণস্হায়ী, বড়ই অনিশ্চিত তাই প্রতিটি মুহূর্তে খুঁজে নিই ছোটো ছোটো খুশিগুলোকে যাতে আমার খুশির কাছে রঙচটা ব্যথা গুলোরও মুখভার হয়ে যায়। দুঃখের পাহাড়টা যেন এতটা ভারী না হয় যেখানে ছোটো ছোটো সুখগুলো তার অনুভূতি হারাবে! যেটুকু দুমুঠোতে কুড়িয়ে নিতে পারবো সেইটুকুই জীবনের পরম সম্পদ।
ভালো, মন্দ, আলো আঁধারি, দ্বিধা দ্বন্দের এই জীবনে শুধু এভাবেই বেঁধে দিই স্মৃতির ভালোবাসাময় এক সেতু আর ভাসতে থাকি সময়ের ভেলায়!

"শুধু যাওয়া আসা শুধু স্রোতে ভাসা"



শব্দজব্দ

১	২		৩	■	৪	৫
৬		■		■	৭	
৮		■	৯			■
	■	১০	১১	■	■	১২
১৩	১৪	■	১৫		১৬	
■	১৭	১৮		■	১৯	
২০			■	২১		

পাশাপাশি: ১.প্রিয়ভাষিনী/শুভচন্ডী দেবীবিশেষ। ৪.ঘোল। ৬.শক্তি। ৭.সংখ্যা বিশেষ/ না। ৮.বিনাস/ সঙ্গীতের তালের নির্দিষ্ট পরিমাণ। ৯.সমুদ্র। ১০.মহাদেব। ১৩.ঋণ বাবদ দেওয়া অতিরিক্ত অর্থ। ১৫.গোল্লায় যাওয়া। ১৭.মৃত্যু। ১৯.শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র। ২০. ফর্মান/ আদেশপত্র। ২১.মৎস্যজীবী।

উপরনিচ: ১.এমন একটি বাংলা শব্দ যাকে উল্টে লিখলেও একই থাকে। ২.বৃত্তাকার অঞ্চল/ কঙ্কন। ৩. মেঘ। ৪.কন্যা, দুহিতা। ৫.কেনা। ১১.অতিথিকে অভ্যর্থনা। ১২.দেহ , শরীর। ১৪.আন্দোলনকে বল প্রয়োগের দ্বারা প্রশমিত করা। ১৬. ডেকে পাঠানো। ১৮.বাতিল/ খারিজ।

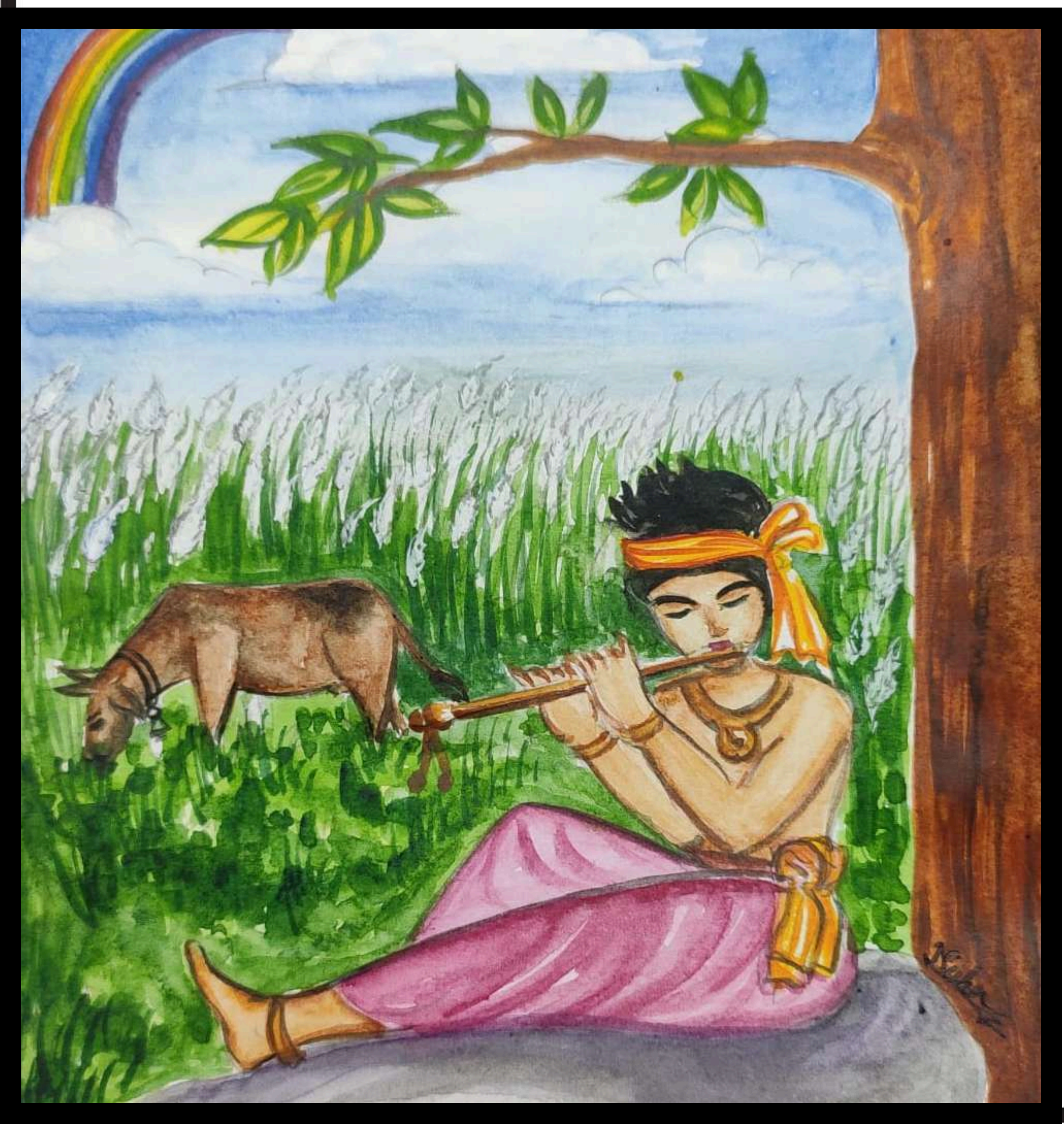
প্রীতির পরশ

জলি ঘোষ

নয়ন মেলে দেখ না চেয়ে শুভ্র কাশের সারি
সুরভিত শিউলি ফুলে মন নিল আজ কাড়ি
কী অপূর্ব দেখ আহা রে
পেঁজা তুলোর ওই বাহারে
সাতরঙা রঙ রামধনু দেয় দূরদিগন্তে পাড়ি।

রাখাল রাজা বাজায় বাঁশি মাঠে চপল ধেনু
সবুজ ঘাসের গালিচাতে সাদা কাশের রেণু
আগমনীর সুরে সেজে
সপ্ততারে উঠলো বেজে
উমা মায়ের আবাহনে অরুণ আলোর বেণু।

জুঁই কামিনী দুলছে দোদুল পবন মৃদুমন্দে
প্রীতির পরশ জাগায় প্রাণে পুলক রন্ধ্রে রন্ধ্রে
আয় না রে তুই আয় না ছুটে
অসীম খুশি নে রে লুটে
হিল্লোলে আজ ওঠ রে মেতে পুজোর নব ছন্দে।



ছড়ায় আলো কেমন শশী আজকে
জ্যোৎস্না রাতে
চুপিসারে তারার সনে রঙ্গরসে মাতে
হৃদয় বীণার অনুরাগে
শুভক্ষণে প্রেম যে জাগে
মান অভিমান সবটা ভুলে রাখ না
হাতটা হাতে।

আঁকায় - নীহা সাঁধুখা

হে বক্তৃতাকার

তৈমুর খান

বক্তৃতা দীর্ঘ করবেন না
প্রসঙ্গের বাইরে যাবেন না
মঞ্চ কাঁপাবেন না
হাততালির জন্য ব্যস্ত হবেন না

কে কাকে ভোট দেবে কেউ জানে না
কে কাকে পছন্দ করে কেউ জানে না
শুধু হাওয়া গরম করে
শুধু জল ঘোলা করে পরিবেশ নষ্ট করবেন না

দেশ দেশেই আছে
জনগণ জনগণেই আছে
মন মনেই আছে
জ্ঞান দেওয়ার বদলে উত্তেজনা দেবেন না



আপনার বীরত্বের পরিমাপ কী
আপনার দেশপ্রেমের পরিচয় কী
আপনার মানবপ্রেমের পরিচয় কী
আপনার মেধার পরিচয় কী সবাই জানে

ইতিহাস সৃষ্টি করতে চান?
জনগণকে ভালবাসতে চান?
আশ্বাস দিতে দিতে অনেকদূর চলে গেছেন
আজ মাটির দিকে তাকান, কান্নার দিকে
তাকান, অন্ধকারের দিকে তাকান...

আঁকায় অঙ্কিতা ভূঁইয়া

সন্ধ্যাবাড়ি

সরকার মীনা

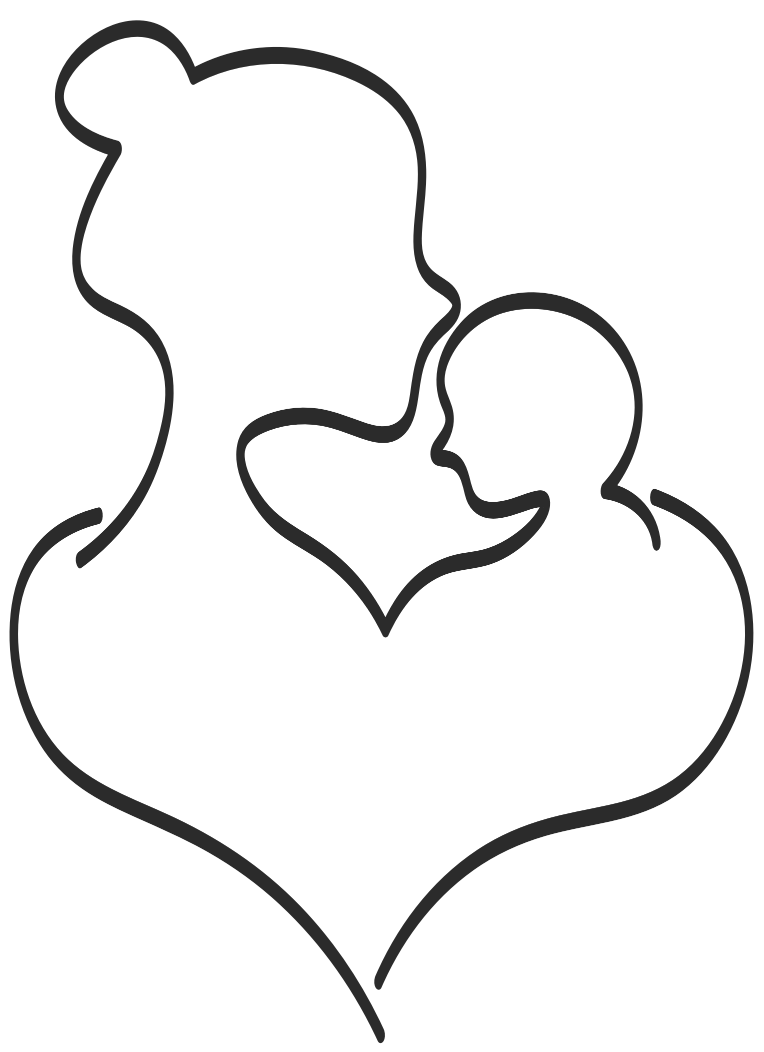
(শ্রদ্ধেয়া আম্মাকে নিবেদিত)

মায়ের অদর্শনে আমাদের শৈল্পিক বাড়িটা
বিষণ্নতায় তলিয়ে যেতে যেতে এক সময়
সন্ধ্যাবাড়ি হয়ে যায়।

বিরহের যাতনা সইতে না পেরে
অসময়ে ঢলে পড়ে গভীর নিদ্রার কোলে
বিষণ্ন বাতাস এসে আমাদের ছুঁয়ে দিলে
মন থেকে খসে পড়ে স্নিগ্ধ প্রাণ।

আমরা সবাই, মানে
আমার ভাই তার বউ, মেয়ে এবং আমি
বিষণ্নতায় ভাসতে ভাসতে মাধুর্য হারিয়ে ফেলি।

আর বাড়িটা সন্ধ্যার পূর্বেই ডিনার সেরে
কম্বলের নীচে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ে।
কেন জানি না -
মা দুদিনের জন্য কোথাও গেলো
এমনি এক ঝাঁক বিষণ্নতা এসে বাড়িটাকে
সন্ধ্যাবাড়ি বানিয়ে ফেলে।



আর আমরা সন্ধ্যাবাড়িতে ঘুমের রাজ্যে
তেলাপোকার মতো হাত পা ছড়িয়ে
মা মা বলে চিৎকার করি।

কিন্তু আমাদের চিৎকার ধ্বনি
সন্ধ্যাবাড়ির চৌকাঠ পেরোতে পারে না।

রঙিন ছেলেবেলা

ডিউক হুদা

খেলার সাথী ছিলো যারা
ছোট বেলায় আমার
কে যে কোথায় কী অবস্থায়
ইচ্ছা বড় জানার।

শেষ বয়সে এসে এখন
মনটি ফিরে যায়
বাঁধন হারা হাসি আনন্দের
রঙিন ছেলেবেলায়।

কত কথা মনে জাগে
কত মজার স্মৃতি
বয়স বেড়ে বৃদ্ধ হয়ে
সব হয়েছে ইতি।

বৃদ্ধকালের ভীমরতিতে
ধরেছে আমায়
আমি আমার ছেলে বেলা
আবার ফেরত চাই।



আঁকায় - নীহা সাঁধুখা

পুজোর আনন্দ বেদনা

সুজন দাশ

মাতি সবাই মাতৃ পুজোয়
যাই ভুলে সব ভেদ ব্যবধান,
ভাসি সবাই উল্লাসেতে
মিলন বোধে নেয় টেনে প্রাণ!

আরাধনায় মা'র চরণে
অঞ্জলি দেই ভক্তি ভরে,
উৎসবের এক আমেজ যেন
যায় ছড়িয়ে সবার ঘরে!

মন্ডপেতে পূজার ক'দিন
হয় সবে বেশ মাতোয়ারা,
বাদ্যি বাজে ঢ্যাম কুড়াকুড়
গঞ্জ শহর গ্রাম ও পাড়া!

পুজোর ছুটি লুটোপুটি
ভাই ও বন্ধু সবাই মিলে,
পাড়ায় পাড়ায় দেখি পুজো
সুখ এসে সব দুঃখ গিলে!

বোধন দিয়ে হয় শুরু এর
দশমীতে শেষ দেখি তার,
বিসর্জনের মাখলে বিষাদ
মন হয়ে যায় এমনিতে ভার!



আঁকায় প্রিয়াঙ্কা মহাজন

অবশেষে বৃষ্টি

মির্জা আসাদুজ্জামান নূর

চারিদিকে এলোমেলো দমকা হাওয়ায়
উচ্ছ্বাস নেই, প্রাঞ্জল বিরহে
তারি মাঝে এক অবুঝ, অচেনা পথিক দাঁড়িয়ে,
কিচিরমিচির পাখির কন্ঠে সুর, নীড়ে ফিরবে বলে!
নীড় হারা এক পথিক গেছে ব্যস্ত-বাহুবলে।

আমিও পাচ্ছি রৌদ্রতপ্ত আকাশে
হঠাৎ কে যেনো ভর করে আছে,
আমায় ডেকে ডেকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত
তাই বুঝি, হেঁকে আসছে বজ্রগম্ভীর-
হালকা মৃদু হাওয়ায় আপন করে নিতে।



আগ্নেয়গিরির ফুটন্ত হৃদয়ে
শিশিরের ছোঁয়ায় আলতো হাত বোলাতে,
মাঠ-চৌচির ক্ষিপ্ত কন্ঠকে, রুখে দিতে
অনুভব করছি, দীপ্তির ঝলমলে রোদ্দুর
আমার ছোঁয়া পেতে, এখনো দাঁড়িয়ে।

পশ্চিমের সেই বজ্র ধ্বনি মেতে দিলো আজ মোরে,
টপটপ করে পড়ছে বুলি, শিউরে উঠে দেহে
বৃষ্টি দেখেছি স্বপ্ন বুনেছি-স্বপ্ন ভাসে জলে,
আজ মেঘলা মন উদাসিনী, তবুও ভিজিনি জলে।

সেই আশাতে

সায়নী আচার্য্য

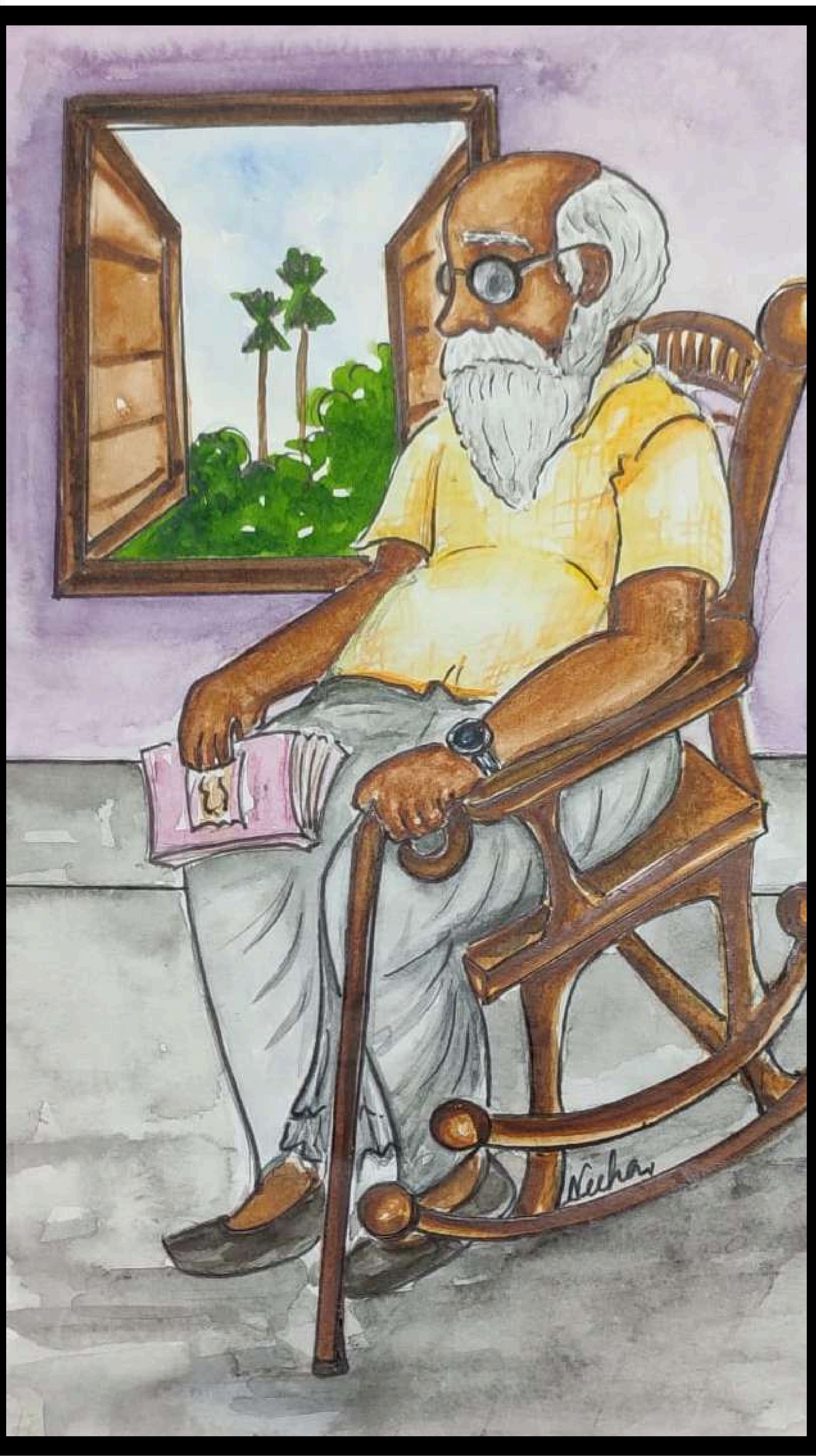
বুকের মাঝে বিষন্নতা
চাপা পড়া কত মায়া
দীর্ঘ দিনের বাঁধন খুলে
হারিয়ে গেল ছায়া।

তারার মাঝে লুকোচুরি
করছে খেলা আহ্লাদে
ধরবে তাকে সাধ্যি কার
মুক্ত হতে আটকাতে।

ফিরবে আবার নতুন সাজে
হয়তো অজানা পথে
যেটুকু বাকি ফিরিয়ে দিতে
স্বর্গের সেই রথে।

সেই আশাতে চেয়ে আছে মন
দরজার ঠিক পাশে।
এই বুঝি সে আসবে চলে
বসবে মুচকি হেসে।

বলবে ওরে যাইনি আমি
ভয় কেন পাস মনে?
এই যে আমি আছি সাথে
বাঁচব তোদের প্রাণে।



আঁকায় - নীহা সাঁধুখা

ফিলিস্তিনি জ্বলছে এখন

চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু

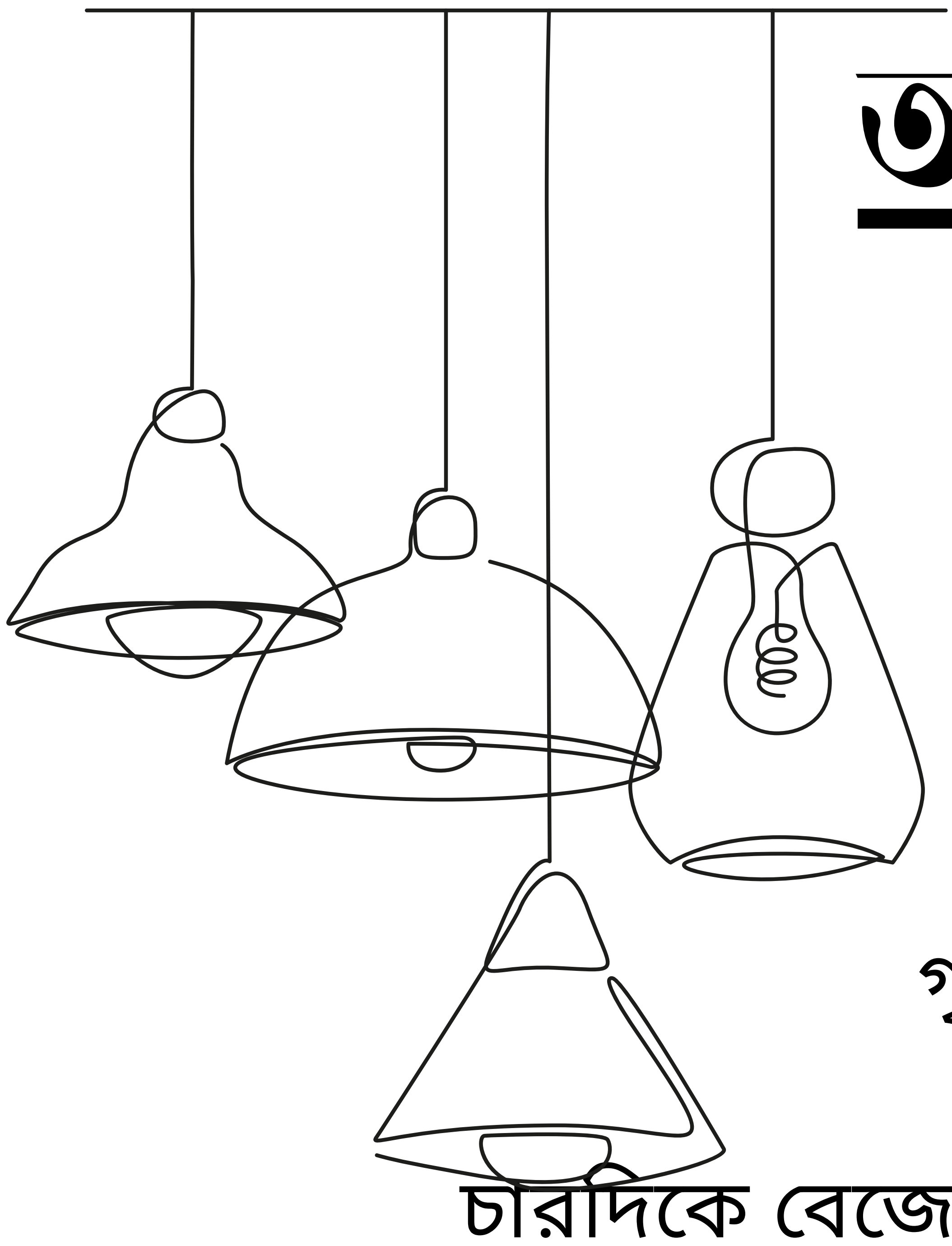
ফিলিস্তিনি জ্বলছে এখন
রক্ত ঝরে রোজ,
স্বার্থবাদী বিশ্ব মোড়ল
কেউ রাখে না খোঁজ।

হাজার হাজার চলছে গুলি
কেমন করে আমরা ভুলি
মারছে বোমা ইসরাইলী
করছে বাড়াবাড়ি,
নির্বিচারে মরছে মানুষ
মরছে শিশু নারী।

জবাব এবার দিতেই হবে
রক্ত শপথ নিতেই হবে
জাগো এবার জাগো,
প্রতিবাদের জলুক আগুন
বিদেশীরা ভাগো।

দেশে দেশে যুদ্ধ তো নয়
শান্তিকে দাও ঠাঁই,
যুদ্ধবাজ মোড়লগুলোর
ওদের মরণ চাই।





আলোর মালা

অজিত দেবনাথ

আলোর মালা খুলে কে যায় গো?
ওই রূপসী পথে,
গৃহকোণের গাছগাছালি তাকিয়ে দেখে,
অপেক্ষা করে।
চারদিকে বেজে ওঠে গান, সজোড়ে ধাক্কা মারে স্থবির
সমাজ সংসার।
পুড়ে যায় মানুষের নক্ষত্রপুঞ্জে সাজানো
উত্তরণের সিঁড়ি,
মাঝরাতে ফোকর দিয়ে অস্তিত্বের জানান দেয়
যতসব অপহৃত প্রাণ।
খিদেয় কাতর মানুষগুলো মুখ গুঁজে পড়ে থাকে
দেয়ালের ফাঁকে,
আর কান্নার ধ্বনি পথে-প্রান্তরে লুটিয়ে পড়ে,
অনাহত স্বপ্ননীল পৃথিবীর ওপর।
ধুলোর ঝড়ে আহত সব অবাঞ্ছিত প্রাণ
চাঁদের দিকে তাকিয়ে খ্যাপা বাউলের মতো সুর ধরে।
এইসব জরাজীর্ণ মানুষগুলোর গলায় পরিয়ে দেবে
না তো আলোর মালা?
গভীর আকাশের নীচে এখন তো শুধু
পড়ে থাকে
সমূলে উপড়ানো ভালোবাসা,
যতসব ফাটলধরা বেদনা-বিধুর ভালোবাসা।
কুয়াশার ধুলোমাখা ধূসর চাদর গায়ে জড়িয়ে নেয়
কি এইসব ম্রিয়মাণ প্রাণ!

কৃতি সন্তান

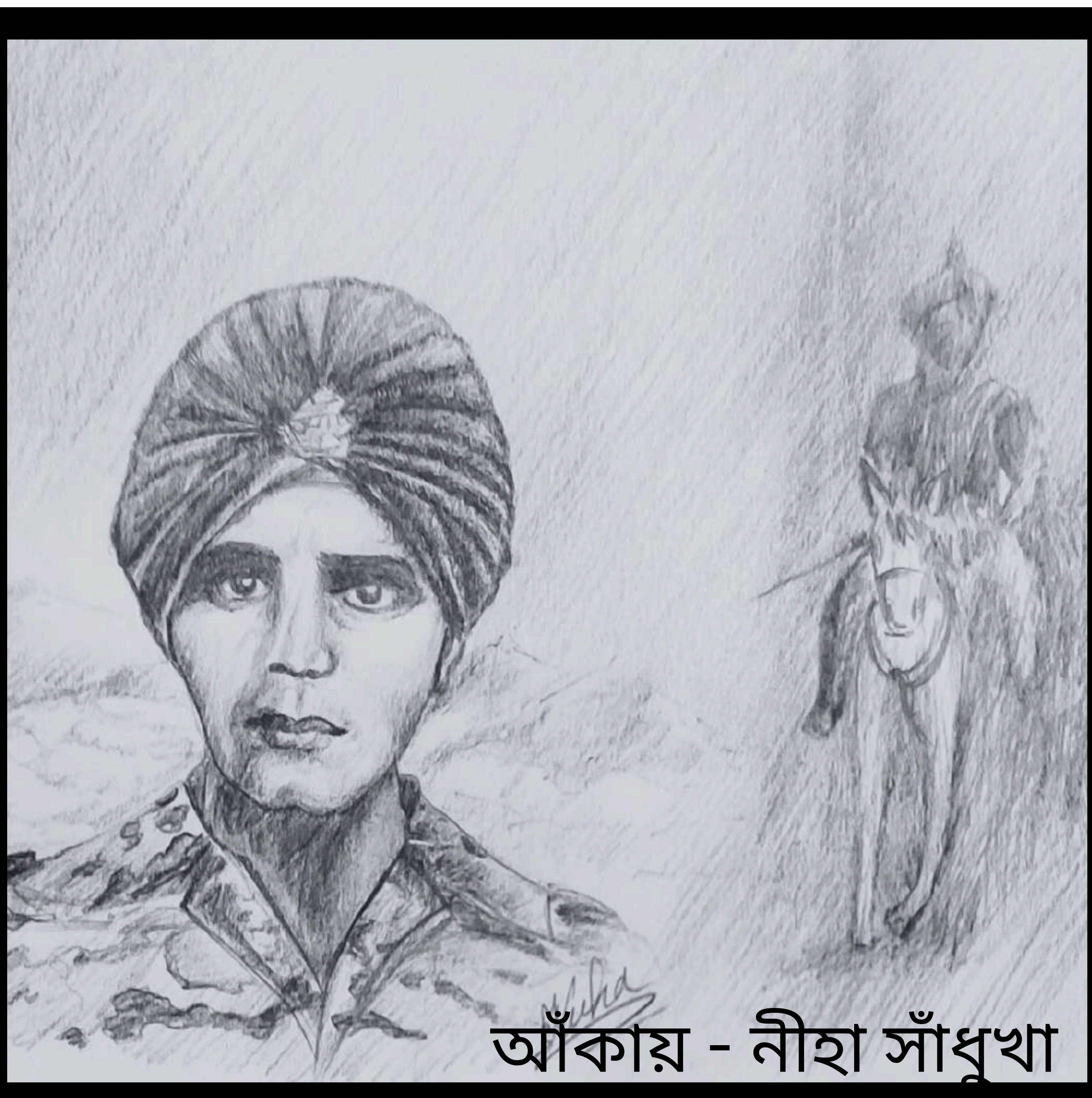
অজিত দেবনাথ

বরফ মেখে সাদা ঘোড়ার ক্ষুরে
জড়িয়ে আছে ভারতবর্ষ-মাটি
ওপারে চীন এপার জন্মভূমি
আত্মা-চক্ষু পাহারা রাতদিন।

শরীর কবে ভেসে গেছে স্রোতে
পাহাড়ী এক নদীর নিশানায়
শত্রু তবু দেখে প্রতি রাতে
সৈনিক এক নিষ্ঠা পাহারায়।

কে ফাঁকি দেয় ঘুমায় কোন সেনা
সপাটে এক থাপ্পড় তার গালে
চমকে ওঠে আধো ঘুমের ঘোরে
ঘুম কাতুরে ঘোড়ার আস্তাবলে।

শত্রু বুঝি ফেঁদেছে কোন ফন্দি
সীমারেখায় দখল নেবার ছল
বাবা নিশি রাতের অন্ধকারে
স্বপ্নে জানায় যা কিছু কৌশল।


আঁকায় - নীহা সাঁধুখা

আজও তিনি সমান আধিকারিক
প্রতি মাসে মাইনে তিনি পান
দু'মাস করে ছুটিও বরাদ্দ
প্রতি বছর প্রোমোশনও হয়

ভারত মায়ের কৃতি এ সন্তান।
ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ
সোনালী রক্তিম
এমন সোনার ছেলে বাবা
হরভজন সিং।

আবার বছর পরে

গোবিন্দ মোদক

ঠিক এমনি করেই বাদল মেঘেদের হটিয়ে দিয়ে
নীল আকাশের দখল নেবে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ
আর অমনি নদীর ধারে
বর্ষাশেষের ঝাণ্ডা ওড়াবে কাশফুলের দল।
শিউলির ফোটা-ঝরায় ঘোষিত হবে শারদ-বার্তা
তখন ভ্রাম্যমান শারদ আলো
ছলকে পড়বে স্থলপদ্মের পাঁপড়ি জুড়ে
চির অবহেলিত শাপলা-শালুকের দল
আবার মাথা তুলবে খালে-বিলে,
আর হঠাৎ করেই একটা পদ্ম-কুঁড়ি
দিঘির জলে মুখ দেখে ঘোষণা করবে
মায়ের আগমন বার্তা;

তখন কুমোরটুলি জুড়ে সাজো সাজো রব
ভোরের ঘাস তার বুকে ধরে রাখবে প্রথম শিশিরবিন্দু
আর একবিন্দু সূর্যালোক
তাকে মুক্তোয় পরিণত করবার অবকাশে
বারোয়ারীতলা সরগরম হয়ে উঠবে
মন্টু বাদল ভোলা কালুদের চাঁদা তোলবার
হাঁকডাকে।
ছোট্ট খুকুর প্রবাসী বাবা ফিরে এলে
তার বন্ধু আয়েশাও টের পাবে —
নতুন জামা-জুতোয় মা-ও আসছেন
আর সনাতন-ঢুলির ঢাকের বোলে
সূচিত হবে – "গৌরী এলো!"
ওদিকে খুকুর দাদু ভাববেন —
কই, এখনও তো রাধু বোষ্টমী
আগমনী গান গাইতে এলো না!



মাৎস্যন্যায়ের বদনাম মুছে

বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত

মজা ততক্ষণই মজা
যতক্ষণ তা নিছক মজা হয়ে
তৃপ্তির মিঠে হাওয়া বয়ে
সুগন্ধি ছড়ায়...

মজা নিতে নিতে সীমা ছাড়ানো ঔদ্ধত্যের
সর্বনাশী খেলায় হারানো হুঁশের ছোবল
হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর-
যে মারে সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই
অভিমানে যদি ঝরে যায় প্রাণ
জ্বলে ওঠা দীপ নিভে যায়!

স্বপ্নদীপের মত চলে যাওয়া সম্পদ
প্রমাণ দিয়ে গেল তার
তবু কি শুধরাবে মজা নেওয়ার স্বভাব!

দোষারোপ, দায় ঠেলাঠেলি ভুলে
মজ্জাগত পাশবিক অভ্যাসের শেকড়
ছেঁড়া
পৌরুষে শুরু হোক মননের
সভ্যতার চাষ

সম্ভব, সম্ভব
যদি জেগে ওঠা মানবের মন জুড়ে
বয়ে যায় অনুতাপের মিষ্টি বাতাস...

নাহলে পড়ুক পিঠে শাসনের চাবুক।

স্বপ্নদীপের মতো...ফয়জানের মতো
আত্মারা, 'এবার ঘুমোই' বলে একবার
কথা বলে উঠুক।



আঁকায় অঙ্কিতা ভূঁইয়া

বৈরাগী হ

সন্দীপ যাযাবর দত্ত

যখন তোমার চুল ছুঁয়েছে আমার চিবুক
তখন আমি আগুন চেনা জতুগৃহ,
সেই আগুনে ছাই হলে এই নরম অসুখ,
দূর থেকে কেউ ডাক দিয়ে যায় বৈরাগী হ।

আলগোছে যেই পেরোচ্ছিলাম সীমান্ত সুখ,
তুমিও নিছক চঞ্চলা এক মায়ামৃগ,
নিঃস্ব তূনীর হিসেব মেলায় ভ্রষ্ট শরের
আড়াল থেকে বলছিল কেউ বৈরাগী হ।

দ্বিধার বাঁকে ব্যর্থ মিছিল থমকে গেলে,
অলস শরীর মিইয়ে হঠাৎ কী নিস্পৃহ,
বিষাদ গোনা জীবন তখন শূন্যে তাকায়,
ভাগ্যিস সেই ডাক শোনা যায়, বৈরাগী হ।

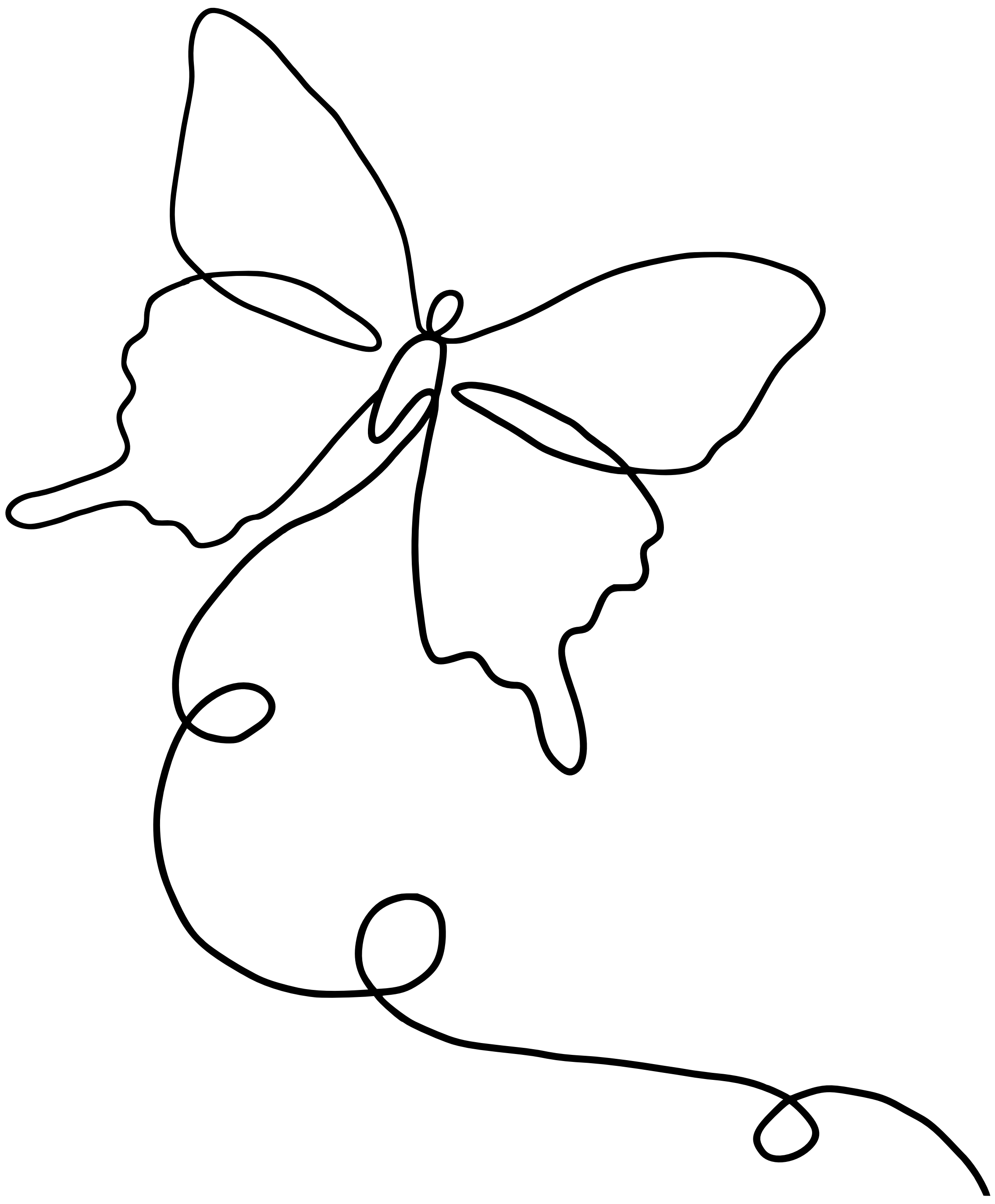
নিবিড় তোমার ছায়ার পাশে নীরব বসে,
সহজিয়া সে ডাক জাগায় তুমুল দ্রোহ,
পক্ষ চেনার টালবাহানায় দিইনি সাড়া,
তুমিও কি বলবে এবার বৈরাগী হ!



স্বাধীনতার স্বাধীনতা

আখতারুল ইসলাম খোন্দকার

স্বাধীনতা কোনও খুনি-সন্ত্রাসি, দেশদ্রোহী
নারী ও শিশুর ধর্ষণকারী
অমানুষ, হিংস্র পশুর জন্য নয়।
স্বাধীনতা কোনও রক্তচোষা চোরাকারবারি
সুযোগ বুঝে উচ্চ মুনাফালোভী
অন্যায় ভাবে পরের সম্পদ লুন্ঠন
ঘুষখোর, দূর্নীতিবাজদের জন্য নয়।
স্বাধীনতা কোনও উচ্চবিত্ত ভোগবিলাসী
হঠাৎ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়া
গাড়ি-বাড়ি, ব্যাংক ভর্তি টাকা
আর অর্থ পাচারকারীদের জন্য নয়।
স্বাধীনতা শুধু, বেদীতে ফুল দেওয়া
বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা
ঢাক-ঢোল পিটিয়ে রাজনীতি করে
ছুটির আনন্দে মাতা নয়।



স্বাধীনতা, খেটে খাওয়া
সাধারণ সহজ - সরল মানুষের জন্য,
ছিন্নমূল গরীব, অসহায়দের
খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা
ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য।
ত্রিশ লক্ষ জীবনের রক্তের বিনিময়ে
দু'লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম দিয়ে
মুক্তিযোদ্ধাদের পরিশ্রমের ফল
ঘুমিয়ে থাকা শহীদের চাওয়া
স্বাধীনতার স্বাধীনতা আমাদের কাম্য।

দান

অদিতি ঘটক

একটু শুনবেন, ঠিক কজন আছে বলবেন--
নাননা, আমাকে ধর্তব্যের মধ্যে ধরবেন না
আমি সঠিক ভাবে জীবিত বা মৃত কোনোটাই নই, জীবন্মৃত বলতে পারেন।
আমার কাঁধে বিরাট এক গুরু দায়িত্ব
যারা প্রকৃত বেঁচে তাদের খোঁজার

ঠিক কজন, সত্যি বেঁচে আছে
একটু বলবেন-

খাঁটি কথাই বলেছেন যে, মাথার দোষ।
তা মাথাকেই বা দোষ দেওয়া যায় কি করে বলুন।

জন্ম থেকেই সে যে যুদ্ধ দেখছে

আপনি নিশ্চিন্তে শুয়ে খাটে পা দোলাতে দোলাতে
টিভির খবরে আর নেটে গোলা গুলি ছোঁড়া দেখেন

এই যে সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া বধ্যভূমি-
আপনি বলবেন, কি যা তা, পাগলের প্রলাপ!
গাছে গাছে ফুলের বাহার, পাখিদের কুজন গীত, জলের মধুর কলধ্বনি
ললিত রাগের মতো বাতাসের আলতো ফিসফিস।প্লাটিনামের মতো মহার্ঘ উজ্জ্বল রোদ
যুদ্ধ কোথায়! এইসব প্রকৃতির অপরূপ সজ্জা। প্রাণ ভরে দেখুন
আর পাঁচজনের মতো উপভোগ করুন।

এই যে অদৃশ্য এত যুদ্ধ, যার সঙ্গে আপনার নিত্য লড়াই

আপনি জানেন! গাছ আর থাকছে না-
যারা থাকছে তাদের ভোল পাল্টে দেওয়া হচ্ছে এখন 'মিক্সিং' বেশ অন ডিমান্ড।
এখন আকাশে বাতাসে জলে স্থলে শুধুই মিক্সিং

এও বেশ ভালো, জানেন,- আমার খিদে নেই, তবু একটা খাবার বারবার দেখিয়ে আমার স্পৃহা জাগানো। চমৎকার ফন্দি। ঠিক মাকড়শার মতো-

ঠিক কজন আছেন? বলতে পারবেন?

সেই কোন কাল থেকে লড়তে লড়তে
আপনি হারিয়ে ফেলেছেন আপনার যাবতীয় পেলবতা
এখন মন এখন পাথর। ধাক্কা খেলে ঠং করে ধাতব আওয়াজ আসে

ক্ষীণ এক ধ্বনি আপনার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে।
কারন উচ্চগ্রামে শুনতে শুনতে আপনার শ্রবণ শক্তি কমে এসেছে।

আপনি চোখের সামনে খুব পরিস্কার দেখতে পান।
দূরের দৃষ্টি আপনার অনেককাল আগেই ঝাপসা হয়ে গেছে।

এখন কেমন সব ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকে
আপনি ভাবেন ওখানে পৃথিবী শেষ

আপনার চামড়া যা দেহের সব থেকে বেশি অংশ জুড়ে আছে
তা আর চিড়বিড় করে না।
কারন গন্ডার নামক জন্তুর বাহ্যিক আবরণের বর্মকে আপনি আপন করে নিয়েছেন।

অথচ সমস্ত ধরনের পেলবতা, সুক্ষতা আপনার মা আপনাকে উপহার দিয়েছিলেন। আগলে রাখতে বলেছিলেন
বলেছিলেন, 'তোর খোকাকে দিস'

স্বপ্ন যদি এমন হতো

নিবেদিতা দে

সেই স্বপ্নমাখা গভীর দু-চোখ
উজ্জ্বল অথচ সমুদ্রের মতো গভীর।
কবে যেন দেখেছিলাম, ঠিক মনে নেই!
মনে আছে শুধু একজোড়া গভীর চোখের চাউনি।

বড়ো স্নিগ্ধ ও কোমল,
কিছু কি বলতে চেয়েছিলে চোখের গভীর ভাষায়! না বলা কথায়?

আমি মনে মনে বলেছিলাম বেশ,
এই ছেলেটা তুই কি আমার স্বপ্ন হবি?
আমার রাত জাগা চোখের পালকের স্বপ্নীল ঘুম হবি?

নাহ্ কিছুই বলতে পারিনি সেদিন।
বুকের ভিতর অজানা তোলপাড় করা ঢেউ আছড়ে পড়েছিল মনের
আনাচে কানাচ!

অবনত মুখে লজ্জা লুকিয়ে স্বপ্ন কুড়িয়ে,
মেঘ কুড়িয়ে রেখেছিলাম তাজা স্মৃতির পাতায়।

তোর আমার স্বপ্ন ছোঁয়া দিনে আজও মেঘ ভেসে যায়।
বৃষ্টি ঝরায়, শুকনো ডালে কুঁড়ি ধরে, ফুল ফোটায়,
শ্রাবণ ধারায় ভিজিয়ে দিয়ে যায়।

বসন্ত আসে অভিমানী রঙ নিয়ে, বুকের ভিতর দ্রিমি দ্রিমি মাদল
বাজিয়ে,
তোর আবির মাখা রঙগুলো
পাগল সমীরণে আমার মনে দোলা দেয়।

নীল আকাশের নীচে সবুজ গালিচায়,
চাঁদের জ্যোৎস্না ভাসিয়ে নিয়ে যায়;
এইভাবেই আমাদের ভালো থাকা, স্বপ্ন দেখা, দূরে থেকেও, ছুঁয়ে ছুঁয়ে
হৃদয়ে হৃদয় স্পর্শ করে যায়।



পাইনাপেল রাইস

পিয়াসা চৌধুরী



বাঙালি হেঁসেলে পুজো মানেই রংবাহারি সব খাবারের সমাহার। পুজোয় একটু পেট পুজো না হলে বাঙালির ঠিক সয় না বলাই ভালো। তাই কনিষ্ঠের তরফ থেকেও আপনাদের জন্য শেষ পাতে রইল পাইনপেল রাইস। আশা করছি এই লোভনীয় খাবারটি আপনারা একদম মিস করবেন না। তাই নিজেদের হেঁসেলে বানিয়ে নিতে দেখে নিন পরের পাতায়।

১- ১/২আনারস।
২- ১কাপ বাসমতি চাল।
৩- ৪চামচ সাদা তেল।
৪- ৪চামচ গাওয়া ঘি।
৫- গোটা গরম মসলা (এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ)।
৬- কাজু বাদাম, কিসমিস, আমন্ড, চেরি।
৭- দেড় কাপ জল।
৮- স্বাদমতো লবণ।
৯- স্বাদ অনুযায়ী চিনি।
১০- ১চামচ ইয়েলো ফুড কালার।

প্রণালী :
প্রথমে আনারস লম্বা করে কেটে দু ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। এবার ছুরি দিয়ে কিউব করে ভেতরে চিরে দিয়ে চামচের সাহায্যে পিস গুলো বার করে ছোট ছোট টুকরো করে নিতে হবে। ২কাপ টুকরো করা আনারস আলাদা করে রেখে দিতে হবে। এবার টুকরো করে কেটে রাখা আনারসের মধ্যে অল্প লবণ ও চিনি মিশিয়ে রেখে দিতে হবে। আনারসের খোল পরিবেশনের জন্য লাগবে আমাদের। এরপর চাল ২-৩ বার ধুয়ে খুব ভালো করে জল ঝরিয়ে হালকা শুকিয়ে নিতে হবে। শুকানোর জন্য চাল পরিষ্কার কাপড়ে আধ ঘণ্টা মতো বিছিয়ে রেখে দিলেই হবে। চাল শুকিয়ে গেলে চালের মধ্যে ইয়েলো ফুড কালার মিশিয়ে নিতে হবে। এবার গ্যাস অন করে একটি কড়াই বসিয়ে তার মধ্যে ঘি ও সাদা তেল দিয়ে একে একে এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, তেজপাতা দিয়ে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। সুগন্ধ বেরোলে চালটা দিয়ে লো ফ্লেমে ভাজতে হবে। ভাজতে ভাজতে চাল গুলো দেখতে ঝুরঝুরে হয়ে এলে বুঝতে হবে চাল ভাজা হয়ে গেছে। চাল ঠিক মতো ভাজা না হলে পোলাও ঝরঝরে হবে না। চাল ভালো করে ভেজে এর মধ্যে দেড় কাপ মতো জল ও লবণ দিয়ে মিডিয়াম ফ্লেমে ভাত করে নিতে হবে।

এরপর অন্য একটি কড়াই বসিয়ে তার মধ্যে তেল ও গাওয়া ঘি গরম করে কাজু, কিশমিশ ভেজে নিতে হবে। এবার এর মধ্যে তৈরি করে রাখা রাইস দিয়ে একটু নাড়া চাড়া করে আনারস, চিনি স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে দিতে হবে। অল্প একটু নাড়া চাড়া করে আনারস মাখানো যে জল টা বেরিয়ে ছিল সেটা অল্প অল্প করে মেশাতে হবে লো ফ্লেমে। সব একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। লবণ ও চিনি একটু দেখে দিতে হবে কারণ আনারসের জলে চিনি ও লবণ আগে থেকেই দেওয়া ছিল।আনারসের যে খোলটি রাখা ছিল তার মধ্যে রাইসটি রেখে উপর থেকে কাজুবাদাম, কিসমিস, আমন্ড, চেরি দিয়ে নিজের মতো করে সাজিয়ে পরিবেশন করুন গরম গরম পাইনাপেল রাইস।

শব্দ জব্দের উত্তর

সু	ব	চ	নী		ত	ক্র
ব	ল		র		ন	য়
ল	য়		দ	রি	য়া	
ব		শি	ব			ক
সু	দ		র	সা	ত	লে
	ম	র	ণ		ল	ব
স	ন	দ		ধী	ব	র